অতুলচন্দ্র।

সামাজিক উপন্যাস।

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত।

কলিকাতা।

১৪ নং কলেজ স্কোয়ার,

রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

PRINTED BY A. C. RAY, B.A., AT THE UNIVERSITY PRESS,
14, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

নিবেদন।

গল্পের ভিত্তি সমাজ মূলক নয়, ঘটনা বিশেষের সমষ্টি মাত্র। গ্রন্থ লিখিত চরিত্রের অঙ্গ সমাজ মূলক। চরিত্র সমষ্টিই সমাজ। পাঠক, গ্রন্থের ঘটনা বিশেষের যোজনা করিয়া, সমাজ আঁকিয়া লইবেন; দেখিবেন—সমাজে বাছিয়া ফেলিবার জিনিষ অনেক। সমাজের ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়দাহন একত্র করিলে সমাজকে মহা অগ্নিক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই ব্যক্তিগত দাহন দেখিয়া, কাহারও এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িলেও সমাজের উপকার হইবে। ইহাই আমাদের ভরসা।

গ্রন্থকার।

উপহার।

অভিন্ন হৃদয় শ্রীযুক্ত, বাবু অতুলচন্দ্র রায় এল, এম, এস

মহাশয় প্রিয় কর কমলে।

অতুল বাবু,

আমি জানি আমার প্রতি আপনার অতুল স্নেহ। আপনি সক্ষম, সেই স্নেহ কার্য্যে যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে। আমি অক্ষম, আমার ভক্তি কার্য্যে কিছু দেখাইতে পারি নাই। অতুলচন্দ্রকে আজি সেই ভক্তিভরে আপনার হাতে দেওয়ার সংকল্প করিয়াছি। দুর্ব্বল অতুলচন্দ্রের দুঃখ অন্যে না বুঝিলেও আপনি কতকটা বুঝিতে পারিবেন। আপনি ইহাকে ধরুন—আমি দেখিয়া সুখী হই।

কলিকাতা
১৩০১ বাং

আপনার চির স্নেহাভিলাষী
গ্রন্থকার।

অতুলচন্দ্র।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানুষের মরিতে বড় ভয়। মরিবার নামেই মানুষের প্রাণ মরিয়া যায়। অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে মরিবার ভয় হইতেই সংসারে ভয়ের সৃষ্টি ও বিস্তৃতি। এই ভয়ই সংসার-ভয়ের আদি ও মূল কারণ; আর যত ভয় ইহার শাখা প্রশাখা—মূলের সহিত সম্বন্ধ। অপগণ্ড শিশু বল, যুবক বল, বৃদ্ধ বল এই ভয় লইয়াই জীব জগত সৃষ্ট। তাহাতেই হিন্দুশাস্ত্রকার-বিশেষ পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিয়া, মৃত্যুভয় পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু অপেক্ষা উচ্চতম ভীতি আর নাই। তাহাতেই সংসারের ঘোর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াও জীব মরিতে নারাজ। আত্মহত্যা যে, এত দুঃসাহসের ও কাপুরুষতার কার্য্য, তাহাও এই মরিবার ভয় হইতেই পরিচালিত। দুর্ব্বল হৃদয় মানুষ এই সংসার ভীতি-বৃক্ষের শাখা প্রশাখার যন্ত্রণায় যখন বিদগ্ধ, তখন সে অতর্কিত ভাবে আত্ম জ্ঞান শূন্য হইয়া, মূলের যাইয়া আশ্রয় লয়। সে মরিতে বলিয়া আত্মহত্যা করে না; ঐই শাখা প্রশাখার যন্ত্রণা এড়াইবে বলিয়াই মরে। আত্মহত্যাকারীর ন্যায় ভীরু কাপুরুষ জগতে নাই। সে যদি মৃত্যু ভয় ধারণা করিতে পারিত, তবে আপনি মরিয়া যাইত। শ্মশান দেখিলে মৃত্যু ভয়ে মানুষের প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

তাহাতেই মানুষ শ্মশানকে এত চক্ষের দূরে রাখিতে চায়। অই দেশ শ্মশান !!! ইহার নিকটে কাহার বাড়ী নাই, ঘর নাই। এই পরম সুহৃদকে দূরে রাখিতেই মানুষ সচেষ্ট। চাহিয়া দেখ, এ শ্মশান ক্ষেত্র কেমন নির্জ্জন, কেমন নীরব। মাঝে মাঝে গৃধ্র শকুনির শব্দ, দিনের বেলায় অদূরে রাখালগণের গ্রাম্য সঙ্গীত ধ্বনি, আর কখন কখন শববাহক-দিগের ভীতিময় হরিধ্বনি ভিন্ন এ গভীর নিস্তব্ধতার ঐক্যতান কেহ ভঙ্গ করে না।

সন্ধ্যার পর সে গাম্ভীর্য্য গভীরতর হইয়া, শ্মশান আরও ভীষণ গভীর মূর্ত্তি ধারণ করে। চাহিয়া দেখ, ইহার এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, নল খাগড়ায় পূর্ণ থাকিয়া, ক্ষুদ্র বনের ন্যায় দেখাইতেছে। পুষ্করিণীর অপর পারে একটা ক্ষুদ্র অরণ্য মিশামিশি গভীর হইয়া উত্তরে চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিম প্রান্তে মতিগঞ্জের খাল, উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। স্থানটীর সুনাম এত যে, রাত্রিকালে খাল বাহিয়া যাওয়ার সময়, এই অরণ্যের নিকট আসিলে সকলেই ভয় পায়। মাঝিরা সে সময় গান ছাড়িয়া, হালেই দাঁড়ের কাজ সারিতে চায়; মাল্লারা গুণ ছাড়িয়া দাঁড় বায়, কিন্তু দাঁড়ের পাতায় জল পায় না। আর যাহাদের ভয় কিছু অধিক মাত্রায়, তাহারা গাজীর সিন্নি মানে। কিন্তু এ স্থানটুকু পার হইলে আর গাজীকে মনে থাকে না। বীভৎস দেখিলেই আমরা রাম নাম করি, বিপদ দেখিলেই দেবতায় স্মরণ, কাজেই দেবতাও আমাদের কথায় বড় একটা কাণ দেন না।

পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে ছোট বড় কতকগুলি বট ও অশ্বত্থ গাছ. আম গাছ, আর দু একটী বেল গাছ—যেন এক পিতামহের সন্তান—পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধরে নাই বলিয়াই, শ্মশান হইলেও এক ঘরে বসবাস করিতেছে। মোড়ল বট গাছটী ক্ষমতা দেখাইবার মানসে

যেন শত শত হাতে পৃথিবীটাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবীও নাছাড়বান্দা, বট গাছটার গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য তাহার চারিদিকের ডাল পালা গুলিকে চুলে ধরিয়া নোয়াইয়া রাখিয়াছে। এ ব্যাপারে দিনের বেলায় ও গাছের তলা অন্ধকারময়। এ গাছটীর বুকের নীচে একখানা শিবশূন্য ভাঙ্গা শিব মন্দির। গ্রামের বুড়ারা বলেন, পূর্ব্বে এ মন্দিরে ভূতেশ্বর নামে জাগ্রত শিব ছিলেন। এখন নাই, কালা পাহাড়ের ভয়ে পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া আছেন।

কত কাল হইতে কত মানুষ এ স্থানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। এ স্থানের পূর্ব্ব নাম জানি না; এখন কিন্তু ভূতের পুকুর পাড় নামেই গ্রামে পরিচিত। রাত্রিতে মড়া পোড়াইতে আসিয়া, অনেকে এস্থানে ভয় পাইয়াছে। রাখালেরাও সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া, নানা ভয়ের কথা উল্লেখে স্থানটীর প্রতি বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা ভক্তি আরও বাড়াইয়া দিত। স্কুলের ছেলেরা বিজ্ঞান পড়ে কি না, তাহারা রাখালদের কথা মুখে মুখেই উড়াইয়া দিত।

এ স্থানে কোথাও রাশি রাশি পোড়া কাঠ পড়িয়া আছে। পোড়া হাড়ে মিশামিশি হইয়া, অঙ্গারের স্তূপ, ভস্মের স্তূপ পড়িয়া বিভীষিকার ছড়াছড়ি! কলসীগুলি রাখাল অপদেবতাদের অনুগ্রহে চূর্ণ বিচূর্ণ। কোথাও মাঝে মাঝে দু একটী তুলসী গাছ—কোনটী একবারে শুষ্ক; কোনটী নিতান্ত পরমায়ু বলে প্লীহা রোগীর ন্যায় জীবিত—অপরিমিত কুইনাইন খাইয়া মরিয়াও যেন মরিতেছে না।

সংসারে কজন লোক আছে, কজন বীর পুরুষ আছে এস্থান দেখিলে যাহার ভয় হয় না? এ স্থান ত নীরব, তবু যেন বলিতেছে সংসার পান্থ নিবাস। পান্থ নিবাসে বসিয়া ভূপতি, ধনী গর্ব্ব করিও না, এ স্থানে সমুদয় খর্ব্ব হইবে। তোমার ধন সম্পত্তি এস্থানে একটী বালুকা কণা

হইয়াও মূল্য হীন। শ্মশান আবার বলিতেছে "রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান আমার নিকট সকলেই সমান। মানুষ আমার নিকট আইস, আমি সকলকে এমন সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিব যে, কাহারও মনে হিংসা থাকিবে না, দ্বেষ থাকিবে না, মান অপমান জ্ঞান থাকিবে না; আমার নিকট আসিলে সকলেই সমান হইবে। আমি সাম্যের প্রশস্ত স্থল। সংসারের সাম্য লইয়া যতই কেন বাগাড়ম্বর কর না, আমার পূর্ব্ব প্রদেশে সাম্যভাব অস্তিত্ব শূন্য। এই মহা পথেই অনন্ত লক্ষ্য মানবাত্মা অনন্তে প্রবেশ করিয়া কার্য্যানুরূপ আত্ম প্রসাদ বা আত্মগ্লানি উপভোগ করে। এ পথের পূর্ব্বে পাপী পুণ্যবানে মিশামিশি; এ স্থানে সাম্য ভাব, এ স্থানের পর অনন্ত ছাড়াছাড়ি।

আর শ্মশান পরম পবিত্র মহাতীর্থ। এ স্থানে নিতান্ত পাপাত্মারও পরিণাম ভয়ে চিত্ত শুদ্ধি উপস্থিত হয়। সাংসারীর কথা দূরে থাকুক, মহাযোগী মহাদেব পর্য্যন্ত শ্মশানকে যোগের উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই শ্মশানের ন্যায় তপস্যার উপযুক্ত স্থান আর নাই, শবের ন্যায় যোগ বেদী আর কি আছে? পূর্ব্বকার যোগী ঋষি মহাজ্ঞানী ছিলেন; তাহাতেই তাঁহারা শব পাতিয়া, শ্মশানে বসিয়া তপস্যা করিতেন। আজি কালিকার অল্পজ্ঞানী লোক, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। মানুষ তুমি যখন শ্মশান দেখ, শ্মশানের ভস্মরাশি দেখ, শ্মশানের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিরাশি দেখ, তখনই সংসারের নশ্বরতা তোমার হৃদয়ে সুন্দর জাগ্রত হয়। তখন তুমি চিত্ত-শুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত। তখন তোমার হৃদয়ে ঘোর বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব কালের মহা পুরুষগণ শবে বসিয়া শব দেখিতেন; ভাবিতেন, আমাকেও শব সাজিতে হইবে। নর কপালে পান করিয়া মনুষ্য অদৃষ্টের পরিণাম দেখিতেন; অস্থিমালা গলে পরিয়া, দেহের ক্ষণ ভঙ্গুরতা প্রাণে জাগ-

র্কে রাখিতেন। সংসারে, বিষয়ে তাঁহাদের বৈরাগ্য হইত ; তাহারা চিত্ত সংযমী হইয়া, তপস্যায় একাগ্র চিত্ত হইতে পারিতেন।

দুই একদণ্ড রাত্রি হইয়াছে। আকাশ একেবারে তারাশূন্য। কোথাও জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, নীরব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, গভীর অন্ধকার গভীরতর। বাতাস একেবারে বন্ধ। কিন্তু এ ভীষণ অন্ধকারকেও অবহেলা করিয়া, বিজলীর আলো বিভীষিকাময় শ্মশান ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছে। চঞ্চল স্বভাব —চমকিয়াই আবার নিবিয়া যাইতেছে। এ সময়—প্রকৃতির এই ভীষণ অভিনয়ের সময় সে নীরব, নিস্তব্ধ, দিশাহারা, গম্ভীর, অনন্ত ব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া, অনতি দূরে শব্দ হইল "বলহরি।" শ্রোতার প্রাণ কাঁপাইয়া আরও গভীর রোলে শব্দ হইল "হরিবোল।" ক্রমে এ বিভীষিকাময় শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামবাসীরা একটী শব হইয়া শ্মশানে প্রবেশ করিল। শ্মশান যাত্রীরা সঙ্গে তামাক আনিয়াছে, হুঁকা আনিয়াছে, এক প্রভু বগলে চাপিয়া দুটী মদের বোতল আনিয়াছেন। তাহারা শব নামাইয়াই তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল। দুটী লোকের সহিত মদের ঘনিষ্ঠতা কিছু অধিক ; তাহারা দুই এক গ্লাস উদরস্থ করিয়া শ্রান্তি দূর করিল। দু এক গ্লাস পান করিয়াই বলিল "দে ব্যাটারা হরিধ্বনি দে।" অমনি আবার শব্দ হইল বল হরি, হরিবোল।" একটী প্রাচীন ছিলেন, তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওগো আকাশের অবস্থা ভাল নয়, শীঘ্রই ঝড় উঠিবে।" কথায় কেহ শবের বাঁধন খুলিতে লাগিল, কেহ চিতার আয়োজনে নিযুক্ত হইল। যাহারা খাতিরে আসিয়াছে, তাহারা কেবল তামাকের পর তামাক চালাইতে লাগিল।

অল্প কাল পরেই ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি—ক্রমশঃ বৃদ্ধি। নীরব বাতাস

আর নীরব থাকিতে পারিল না; দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ঝড়ও উঠিল। এখন ফোঁটা ছাড়িয়া মুশল ধারায় বৃষ্টি। দিক্ দিগন্ত কাঁপাইয়া গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জন। শ্মশান যাত্রীদের কি সাধ্য আর শ্মশানে থাকিতে পারে? তাহারা ভয়ে ত্রাসে শব ফেলিয়া গ্রামাভিমুখে ছুটিল।

কতক্ষণ এরূপ ভাবে ঝড় বৃষ্টি হইয়া গেল। তেজ কাহারো চিরদিন সমভাবে থাকে না। দেবগর্জ্জন থামিল; বৃষ্টিও থামিল। কিন্তু বিজলী থামিতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। একি! মরা মানুষ উঠিয়াছে যে? অসম্ভব ভাবিও না, বিস্ময়াপন্ন হইও না, ঐ দেখ মরা মানুষ উঠিয়া বসিয়াছে। ঘোর নিদ্রা হইতে উঠিয়া যেন চারিদিক চাহিতেছে। মরা মানুষ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সম্মুখ দিয়া একটা শৃগাল দৌড়িয়া গেল; বট বৃক্ষে গৃধ্র শকুনিগুলি পাখা নাড়িয়া জল ঝাড়িল, অদূরে কি যেন একটা নিশাচর জন্তু শিশুর কান্নার মত শব্দ করিল; তাহাও কিছু বুঝিতে পারিল না। বালিকা অতি কাতর, অতি দীনস্বরে ডাকিল "মা।" নিকটস্থ অরণ্য হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বালিকা আবারও ডাকিল "মা।" এখন সে শুনিতে পাইল—শান্তিময় স্নেহ সঙ্গীত স্বরূপ শুনিতে পাইল "বাছা! উঠ, সংসারে বড় জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়াছ; আর সংসারে ফিরিয়া কায নাই।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার ক্ষুদ্র দেহটী একবারে কোলে তুলিয়া লইলেন। বিজলীর আলোকে বালিকা দেখে; আগন্তুকের মস্তক জটাভারে আবৃত, লম্বিত শ্মশ্রু তাহার দেহের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুদীর্ঘ ত্রিশূলে দক্ষিণ হস্ত ভর করিয়া, বাম হস্তে বালিকার দেহ ধরিয়া দণ্ডায়মান। বালিকা ভয়ে চক্ষু বুজিল; ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল

"আপনি কে? আমি কোথায়?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "মা! আমি সন্ন্যাসী, এ শ্মশানক্ষেত্র। তুমি মরিতেছিলে, দৈব কৃপায় রক্ষা পাইয়াছ। আমি যোগবলে তোমার কষ্ট জানিতে পারিয়াছি। মা! সংসারে থাকিয়া আর কষ্ট পাইও না" তাঁহার স্নেহস্বরে বালিকার ভয় দূর হইল। আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "পিতঃ! আমি কোথায় যাইব? সন্ন্যাসী বলিলেন "আমার সঙ্গে, মা ভয় করিও না।" সন্ন্যাসী বালিকাকে কি মন্ত্রমুগ্ধ করিলেন। বালিকা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, তাঁহার কোলে কোমল বালিকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বালিকার দেহ লইয়া অরণ্য কোলে প্রবেশ করিলেন।

ঝড় বৃষ্টি এখন থামিয়াছে। শ্মশান যাত্রীরা ফিরিয়া আসিয়া দেখে শব নাই; সকলের বড় ভয় হইল। মাতালগণ পালাইবার সময় একটী মদের বোতল ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা আসিয়াই অগ্রে বোতলের অনুসন্ধান করিল। দেখে বোতলটী একধারে কাত হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ভিতর হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা কেবল বলিতে লাগিল "আগেই ব্যাটাদের বলিয়াছিলাম, শব ছাড়িয়া পালাইতে নাই। ভূতে মদ দিয়া শবটাকে খাইয়া ফেলিয়াছে।" ভয়ে আর কেহ অনুসন্ধান করিতে পারিল না। গ্রামে ফিরিল, আর যাহার যা ইচ্ছা শব সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। মাতালগণ সমস্ত পথে "বল হরি, হরিবোল" ধ্বনিতে প্রাণের জ্বালা নিবাইতে নিবাইতে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরাজ রাজত্ব যখন পূর্ণ যৌবনে গড়াইতেছিল; সাহেবেরা যখন এদেশের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা; গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব চলিয়াছে; আমরা সেই সময় অবলম্বন করিয়া আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলাম। কয়েক বৎসর হইল শিপাহী বিদ্রোহের ভীষণ অভিনয় হইয়া গিয়াছে; কালার ভয়ে এখনও ইংরাজের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। মুসলমানী ভাষা, মুসলমানী আদব-কায়দা দিন দিন চলিয়া যাইয়া, সেস্থানে পাশ্চাত্য হাবভাব স্থান পাইতেছে। ইংরাজী ভাষা, ইংরাজের এটিকেট লইয়া এখন বাঙ্গালী ব্যস্ত। মাতৃভাষা নিরক্ষর-গুরু মহাশয়ের নিকট যাইয়া আশ্রয় লইতেছে।

এখন আর এরূপ হুজুগের কথা শুনা যায় না যে, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে পাদ্রী সাহেবেরা এক চালান বিলিতি মেম লইয়া আসিয়াছেন; যিনি খ্রীষ্টীয়ান হইবেন, তিনি পাঁচ শত টাকা বেতনের একটী চাকুরী ও একটী বিলিতি মেম পুরস্কার স্বরূপ পাইবেন। দেশীয় ধর্ম্মের অপলাপে খ্রীষ্টীয়ানির দিকে যে, টান পড়িয়াছিল, তাহা এখন উদয়োন্মুখ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে ফিরিয়াছে। পাদ্রীরা রাস্তায় পড়িয়া, যীশুখ্রীষ্টের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতে চাহিলেও, দুএক জন ইতর লোক ভিন্ন শিক্ষিত লোক বড় একটা বাইবেলের ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতেছে না।

ইংরাজ রাজত্বের এই পূর্ণ যৌবনের সময় মতিগঞ্জে একঘর ভদ্রসন্তান বাস করিতেছিলেন। নিতান্ত জাঁকজমকের সহিত না হইলেও তাঁহারা মধ্যবিৎহস্থের সুখ স্বচ্ছন্দে গৃজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

প্যারিমোহন রায় ও ভুবন মোহন এ পরিবারের কর্ত্তা। তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়ের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসাই পরিবারের এরূপ সুখ শান্তির কারণ। পরিবারে লোকের মধ্যে স্নেহ, বিশ্বাস ও পবিত্রতা না থাকিলে পরিবারে সুখ শান্তি কোথায়? এ পরিবারে তাহার কোনটীর অভাব ছিল না। সকলেই যেন এক পবিত্র প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ। তাহাতেই এ পরিবারে সকলকেই প্রফুল্ল, সকলকে সর্ব্বদা প্রাণময় বলিয়া বোধ হইত। বাহিরের লোক দেখিয়া বলিত "কি সুখী পরিবার।"

প্যারিমোহন রায় ও ভুবন মোহন রায় দুই ভাই যেমন এক প্রাণে পরস্পর আবদ্ধ; তাঁহাদের পরিবার দুটীও তদ্রূপ দুটী সহোদরার ন্যায় পরস্পরের প্রতি নিতান্ত স্নেহাশক্ত ছিলেন। বিষয় কর্ম্মের ভার-প্যারীমোহন রায়ের প্রতি। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী গৃহ কার্য্যের সমুদয় ভার ভুবন মোহন রায়ের স্ত্রীর হাতে দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ ভুবন মোহন রায়ের কোন সন্তান নাই। প্যারি মোহন রায়ের একটী মাত্র পুত্র সন্তান, নাম অতুল চন্দ্র। বালক বালিকা শূন্য এরূপ সচ্ছল সংসারে, অতুল দেব দুর্ল্লভ জিনিষ বলিয়া, সকলের শান্তির কারণ হইয়াছিল।

পরিবর্ত্তন না থাকিলে কেহ নূতনের সুখ বুঝিতে পারে না। সুখের স্রোতে দুঃখের জোয়ার না ফিরিলে সে সুখও এক ভাব মগ্ন হইয়া পড়ে। বিধাতা তাহাতেই সুখের পার্শ্বে দুঃখ সৃষ্টি করিয়া, জীবের সুখের পরিমাণ আরো বাড়াইয়াছেন। সংসারটী সুখের স্রোতে এক ভাবে ভাসিয়া যাইতেছিল; তাহাতে বাধা পড়িল। অতুলের যখন আট মাস বয়স, মা তাহাকে সেই সময় মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত করিয়া, সংসার ছাড়িয়া গেলেন। মরিবার সময় স্বামী ও দেবুর সম্মুখে;

তাঁহাদের উভয়ের কাছে ভুবন মোহন রায়ের স্ত্রীকে ডাকিয়া, তাঁহার হাতে অতুলকে সমর্পণ করিয়া গেলেন। খুড়ীমা বুক পাতিয়া মার ধন অতুলকে গ্রহণ করিলেন।

আট মাসের শিশু মার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। 'মা' কথা ভাল করিয়া মুখে না ফুটিতে ফুটিতে মা মরিলেন, সকলের চিন্তা হইল শিশুকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া। কতক দিন বালকের মর্ম্ম ভেদী কান্নায় বাড়ী শুদ্ধ লোক ব্যথিত হইয়া পড়িল; প্যারি মোহন রায় স্ত্রীর শোকে আরো কাতর হইয়া পড়িলেন। খুড়ীমার প্রাণপণ যত্নে বালক ক্রমশঃ শান্ত হইতে লাগিল। কিন্তু অতুল শিশুর শৈশব কান্তি বড় শুষ্ক হইয়া পড়িল। ফুলের চারা উদ্যানের কোলে তেজোময় ছিল; বিধাতার খেলায় তাহা টবে রোপিত হইল। প্রকৃতির নিয়মে তাহাকে একটু হীন তেজ হইতে হইবে। প্রচুর জল সিঞ্চন হইতেছে, যত্নের ক্রটী নাই, চারার কিন্তু পূর্ব্বের শ্রী সহজে ফিরিয়া আসিতেছে না। শৈশবে যাহারা মাতৃহীন, তাহারা সংসারের উচ্চতম সুখ হইতে বঞ্চিত। মার স্নেহ যাহার ভোগ হয় নাই, স্নেহ জগতের মহারাজ্য হইতে সে বঞ্চিত। মা শব্দ যাহার মুখে ফোটে নাই, ভাষার আদি শব্দ না শিখিয়া সে ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। মার পবিত্র স্বর্গ ছবি যে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিতে পারে নাই, প্রকৃতির পবিত্র সৌন্দর্য্য সে কখন ভোগ করে নাই। বিধাতার লীলায় অতুল শৈশবে মাতৃহীন, তাহার ভবিষ্যত সুখ-গগন ঘোর অন্ধকার ময়! অতুল শিশু, এখন এ অভাবে তোমার চিন্তা ক্ষেত্র অধিকার করিবে না; কিন্তু পরে বুঝিবে, তুমি সংসার জীবনে কেন্দ্র বিহীন।

মা মরিলেন; পিতা এখনও বর্ত্তমান। মৃত্যুর হৃদয় বড় কঠিন, বড় নির্ম্মম। বালকের অশ্রু জলে, যুবকের হৃদয় ভেদী ক্রন্দনে, বৃদ্ধের

হাহাকারে সে কাতর নয়। স্ত্রীর শোকে ক্রমে কাতর হইয়া, প্যারী মোহন রায়ও কিছু দিন পরে মৃত্যুর কোলে যাইয়া শয়ন করিলেন। মাতৃহীন বালক আজি পিতৃহীন হইল। সুখের সংসারে ভাঙ্গা আরম্ভ হইল। মার অভাবে বালক যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, পিতার মৃত্যুতে তাহার তদ্রূপ হইল না। এখন স্নেহ ময়ী খুড়ীমাই তাহার স্নেহ সাম্রাজ্য; খুড়ীমার বুকে থাকিয়া, পিতার অভাব বালক ক্রমে ক্রমে ভুলিতে পারিল। খুড়াও খুড়ী মার স্নেহে বালক বড় হইতে লাগিল।

মতিগঞ্জ একটী পল্লীগ্রাম। সচরাচর পল্লীগ্রামে যাহা থাকে, মতিগঞ্জে তাহার কোনটার অভাব ছিলনা। গ্রামে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল; একটী পাঠশালা ছিল; একটী বাজার ছিল; আর যুবক সম্প্রদায়ের খোসগল্পে ও গ্রাম্য আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করার জন্য একটী গুলির আড্ডা ছিল—সেইটী ডাকঘর। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, এ আড্ডায় এক এক দলের বৈঠক হইয়া, নানা আলাপ প্রলাপ চলিতে থাকিত। দ্বিপ্রহরে এই আড্ডাই তাশ পাসার রঙ্গ ভূমি। সমাজের কথা, গ্রামের কুৎসার কথার সম্যক্ আলোচনার স্থল এই আড্ডা। সন্ধ্যার পরে গান বাদ্যের ধুমধামে এই আড্ডা যুবকদিগের পক্ষে আরও তৃপ্তিকর হইয়া দাঁড়াইত। আড্ডাধারী পোষ্ট-মাষ্টারটীর ইহাতে কিঞ্চিৎ তামাক খরচ হইত। যুবকদিগের মধ্যে যাহারা ভারতোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প, তাহাদের যত্নে এই গ্রামে একটী "হিত সাধিনী" সভা স্থাপিত হইয়াছিল; একটী সাধারণ পুস্তকালয় ছিল; ছোট খাট রকমের একটী ডিস্‌পেন্‌সরি ছিল। তেজ চিরদিন সমভাবে থাকে না বলিয়া—তাহা ক্রমে ক্রমে দৈন্যদশাগ্রস্থ হইয়া পড়িল। গ্রামের কয়েক জন শক্তি সেবক বৃদ্ধ মতিগঞ্জের বাজারে একটী মদের দোকান খুলিয়া গ্রামটীকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু অবাধ্য ছেলেদের বাড়াবাড়িতে তাহা হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে তাঁহারা বড় অসুবিধা ভোগ করিলেন। কাজেই যথায় তথায় বলিতেন "এ ছেলে বেটারা সব খৃষ্টান।"

মতিগঞ্জের পাঠশালা ভুবনমোহন রায়ের বাড়ীতে সংস্থাপিত। ভোলানাথ বাঁড়ুয্যা নামে জনৈক গুরুদেব এই পাঠশালার ওস্তাদ। তাহার নীচে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষকোপাধিধারী আরও দুইজন সহকারী ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহারা তিন ওস্তাদে মিলিয়া, মতিগঞ্জের বালক দিগের সুকোমল অন্তর ক্ষেত্রে শিক্ষার বীজ বপন করিতে লাগিলেন। তদ্বিনিময়ে মোড়ল ওস্তাদ ২০ তঙ্কা, এক জন ১০ তঙ্কা ও সর্ব্ব নিম্ন ওস্তাদটী মাসিক ৮ তঙ্কা বেতন পাইতেন। বাঁড়ুজ্যা মহাশয় এ গ্রামের লোক নয়, তাঁহার ডাল রুটীর বরাদ্দটা ভুবন মোহন রায়ের বাড়ীতেই হইত। গ্রামের ওস্তাদদ্বয় বাড়ীতে খাইয়া, দিবসে এক ঘুমের পর সাড়ে বারটার সময় আসিয়া, সাক্‌রেদ্‌দিগকে শিক্ষা দিতেন। সাক্‌রেদেরা কিন্তু সকাল বেলা খাইয়া আসিয়া, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদর্শনে বিদ্যালয়ের আশে পাশে বিশেষ উপদ্রব করিত।

ভোলানাথ বাবু নর্ম্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দুই মাস সতের দিন তিন ঘণ্টা পড়িয়াছিলেন। শেষ দিন সাপ্তাহিক পরীক্ষায় অপর একটী ছাত্রের কাগজ নকল করিয়া, দেড়টার সময় ধরা পড়াতে, অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে নাম কাটিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেদিন রেজেষ্টারের খাতায় তাঁহার নাম কেবল মাত্র তিন ঘণ্টা ছিল। এ ঠিকা পড়াতেই ভোলানাথ বাবু নর্ম্মাল স্কুলের যথা সর্ব্বস্ব— আসবাব নয়, এক প্রকার উদরস্থ করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালাপেক্ষা তাঁহার সংস্কৃতে জোর অধিক। তিনি মাঝে মাঝে সাক্‌রেদ্‌দিগের নিকট "বিদলৌ জ্ঞানে, ভাসৌ দীপ্তৌ" প্রভৃতি দুই একটী গণ শুনাইয়া,

কখন বা হিতোপদেশের দুই একটী শ্লোক শুনাইয়া, তাঁহার অগাধ সংস্কৃত জ্ঞান সমুদ্রের ঢেউ তুলিতেন।

ভোলানাথ বাবু দেখিতে সুশ্রী, সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট, বলবান্বক দেহ। শারীরিক দৃশ্যের মধ্যে আয়ান ঘোষের গোঁপের ন্যায় তাঁহারও যে, এক জোড়া গোঁপ ছিল, তাহাই এক মাত্র উল্লেখ করার উপযুক্ত। দোষের মধ্যে তিনি ছাত্রদিগকে বড় ঠেঙ্গাইতেন—তাহারা তাঁহাকে একটা হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভয় করিত।

পিতৃব্য অতুলকে বাড়ীর পাঠশালায়ই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বালক পড়া শুনায় মনোনিবেশ করিল। ভোলানাথ বাবু তাহাকে বেশ যত্ন করিতেন; কেবল মাঝে মাঝে বলিতেন "অতুল বড় অশান্ত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অতুল বড় সুন্দর বালক। তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় পাঠক পাঠিকাকে আমরা বিরক্ত করিতে চাহি না। অথচ তাহার কয়টী সৌন্দর্য্যের কথা না বলিয়াও থাকিতে পারি না। বালকের প্রথম সৌন্দর্য্য—বাল্য হইতেই তাহার মুখে একখানা প্রতিভার ছায়া অঙ্কিত ছিল। জোছনা মাখা কুসুমের ন্যায় তাহার মুখ সেই অপূর্ব্ব প্রতিভায় প্রতিভাত থাকাতে, সকলেই দেখিয়া বলিত "বালক বড় বুদ্ধিজীবী হইবে।" বালকের দ্বিতীয় সৌন্দর্য্য চির প্রফুল্লতা—বিজলীর আলোর মত উহা তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে। মানুষের মুখে ইহা-পেক্ষা সৌন্দর্য্য নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্য নাই পারুক—এমন লোক

কজন আছে, যাহাকে অন্যের প্রফুল্লতায় প্রফুল্ল করিতে পারে না? যদি পূর্ব্ব জন্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম, যদি জন্ম পরিগ্রহ স্থির বুঝিতে পারিতাম, তবে বলিতাম—প্রফুল্লতা পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য প্রসূত চিত্ত প্রসাদ। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল স্বরূপ পর জন্মেও উহা আত্মায় প্রতি ফলিত হইয়া রহিয়াছে। একদিকে প্রফুল্লতা যেমন পূর্ব্ব জন্ম লব্ধ চিত্ত প্রসাদ, তদ্রূপ স্বভাব-বিমর্ষতাও পূর্ব্বজন্ম লব্ধ চিত্তগ্লানি—পর জন্মে পাপের পরিণাম স্বরূপ আত্মায় প্রতিফলিত। শত সহস্র মুখ তোমার সমক্ষে উপস্থিত থাকুক—দেখিলেই প্রফুল্ল মুখ তুমি বাছিয়া লইতে পারিবে। এই প্রফুল্লতার এমনি গুণ যে, ইহার সংস্পর্শে আসিলেও ইহা অন্যের মুখে এক স্বর্গীয় আলো জ্বালিয়া দেয়, অন্য মুখকেও প্রফুল্ল করে। যাহায় মন অন্যের প্রফুল্লতায় প্রফুল্ল হয় না, সে পাপী। অন্যের প্রফুল্লতায় যাহার মনে বিরক্তি জন্মায় সে মহা-পাপী। শুধু সৌন্দর্য্য নয়—প্রফুল্লতা মানব হৃদয়ের স্বর্গীয় মহাবল। প্রফুল্ল হৃদয়কে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সহজে আক্রান্ত করিতে পারে না। যাহার প্রফুল্লতা প্রাণ ময়, সে আপন মুখ দেখাইয়া সংসারকে তাহার আপনার করিয়া তোলে। অতুলের সে প্রফুল্লতায় সকলেই তাহাকে আপনার বলিয়া ভাবিত। অতুলের অপর সৌন্দর্য্য প্রাণময় সরলতা। বালকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ—তাহার সুগৌর মুখখানিতে সরলতার লাবণ্য ফুটিয়া তাহা এক স্বর্গের দৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। প্রফুল্লতায় বাল-কের মুখ জ্যোতির্ম্ময়, সরলতায় তাহা মধুময়। ইহা ভিন্ন বালকের আর এক গুণ—খোলা মেলা প্রাণ। অতুল যাহা ভাবিত, যাহা করিত সমুদয়ই খুলিয়া দিত, কিছুই হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিত না; গোপন কাহাকে বলে বালক জানিত না। বাল স্বভাবে ইহা এক সুমধুর সৌন্দর্য্য। এরূপ বালককে কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? মতি

গঞ্জের আবাল বৃদ্ধ সমুদয় লোকই অতুলকে ভাল বাসিত। বালকের সরল প্রাণেও বিশ্বাস ছিল, গ্রামের সকল লোকই তাহার আপনার। অভিমানের ধার ধারে‌না; ছোট বড় সকল লোকই অতুলের আপন হইয়া পড়িল।

এরূপে বাল্যের সুখময় রাজ্যে খেলিতে খেলিতে অতুল বড় হইতে লাগিল। ক্রমে এক দুই করিয়া অতুল বার বৎসর বয়সে উপস্থিত। বালক গ্রামের স্কুলে পড়িয়া, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পাইল। এখন তাহাকে সহরে যাইয়া ইংরাজী পড়িতে হইবে।

সে সময় ছেলে ছোকরারা এত চালাক চতুর ছিল না। রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব্বে কাশী যাত্রীদের বিদেশ গমনের ন্যায় নূতন ছেলেদের সহরে গমনেও সে সময় একটু নূতনত্ব ছিল। আজি অতুলের সহরে যাওয়ার দিন। খুড়ীমার বুকের ধন তাহাকে আজি কত কষ্টে খুড়ী মা কতক দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতেছেন। খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে বঙ্গ রমণী হৃদয় দেব ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার বিমর্ষ মুখ চক্ষুজলে অবধৌত, তথাপি কত যত্নে অতুলের পাথেয় দ্রব্য জাত প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। বালকের মনে কিন্তু সুখ দুঃখ উভয়ই ক্রিয়া করিতেছিল। গ্রামের ছেলে সহরে যাইবে ভাবিয়া তাহার মুখে হর্ষ। খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহা আবার কাল হইয়া পড়িতেছে।

ক্রমে রওনা হওয়ার সময় উপস্থিত। ললিত, রজনী, বিপিন প্রভৃতি সহরযাত্রী অপর বালকেরাও অতুলের বাড়ী উপস্থিত হইল। ললিতের পিসী, বিপিনের মাসী, পৈলার মা, পাঁচকড়ির শাশুড়ী প্রভৃতি পাড়ার বৃদ্ধারাও বালকদের সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা অতুলের খুড়ীমাকে সান্ত্বনা করিয়া, পথে কিরূপ চলিতে হইবে, কোন নদী পার হইতে

হইবে ইত্যাদি উপদেশ বাক্যে বালকদিগকে সাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন গঙ্গা স্নান করিবার জন্য নৌকায় কলিকাতা গিয়াছিলেন। ললিতের পিসী সকলের বড়, তিনি বলিলেন "ঈশান কোণে মেঘ দেখিলে নৌকা ছাড়িও না।" পাঁচ কড়ির শাশুড়ী বলিলেন "নৌকার ব্রহ্ম রন্ধ্রে একটু জল দিও, কোন বিপদ ঘটিবে না।" একজন পুরুষ উপদেশ দিলেন "নৌকাখানা বরাবর কোণাকুণী ধরিতে মাঝিকে বলিও, তাহাতে বাতাসের জোর লাগে না।" বালকদিগের মধ্যে পেলার মার কেহই ছিল না; সে বলিল "এখনকার ঝড়ে নৌকা পড়ে না।"

বিধবাদিগের সান্ত্বনা বাক্য, উপদেশ বাক্য আদান প্রদানের পর মাঝি মাল্লাদের মাথায় দ্রব্যজাত উঠিল। ললিত একটু বয়স্ক ছেলে, খুড়ীমা তাহার হাতে অতুলকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "দেখ বাবা ললিত, আমার অতুলকে দেখিও।" ক্রমে বালকগণ প্রণম্যদিগকে প্রণাম করিল; অতুল খুড়ীমাকে প্রণাম করিল; তিনি চক্ষুজলে অতুলের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। খুড়ীমা বলিয়া দিলেন "আমাকে হপ্তায় দুইখানা করিয়া চিঠী লিখিও।"

বালকেরা রওনা হওয়ার দুই দিন পর আসিয়া সহরে পৌঁছিল। এটা চলিত ব্যবহার—নূতন ছেলে সহরে আসিলে, পুরাতন ছেলেদের মধ্যে একজন তাহাকে সহরের দেখিবার বিষয় দেখাইয়া আনে। ললিত অতুলকে সমুদয় দেখাইয়া বাহাদুরী লইল। একদিন নদীতে স্নান করিতে যাইয়া ললিত সাঁতার দেখাইতে বেশ "জল ভক্ষণ" করিয়া আসিল। অতুলও দুষ্টুমিতে কম নয়, সে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত "ললিত দাদা, আর সাঁতার কাটিবে কি ?

অতুল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া, মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল।

শিক্ষকগণ তাহার ধারণা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। পিতৃব্য সমুদয় খরচ যোগাইতেছেন; বালক বৃত্তির টাকায় অপর বহি কিনিয়া পড়িতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষায় একটু জ্ঞান জন্মিয়াছে; বাঙ্গালা নাটক নভেলের দিকেই মনোযোগটা একটু বেশী ব্যয়িত হইতে লাগিল।

এরূপে বন্ধের সময় বাড়ী যাইয়া বালকগণ বন্ধ কাটাইত। তাহাদের সুন্দর পরিচ্ছদে গ্রাম নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিত। গ্রামের অপর বালকদিগের নিকট তাহারা ইংরাজী ভিন্ন পরস্পর আলাপ করিত না। ইংরাজীর দর যেরূপই হউক, বুড়ারা শুনিয়া বলিতেন "কালে ইহারা সকলেই হাইকোর্টের উকীল হইবে।" গ্রামের বালকেরা দেখিয়া মনে ভাবিত, তাহারাও কখন সহরে যাইতে পারিবে।

অতুলের বয়স এখন পনর বৎসর। সে বাল্য ছাড়িয়া যৌবন সন্ধিতে উপস্থিত। তাহার মন এখন জীবন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দর্শক, এ অঙ্কের অভিনয় বড় মোহময়। এখন আর বাল্যসরল সুখের জন্য তাহার চিত্ত লালায়িত নয়; এখন সে কল্পনার অনুচর। তাহার চিন্তা, তাহার দৃষ্টি এখন ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য নির্দ্দেশে ধাবিত। এখন সে দেখিতেছে, ভবিষ্যৎ যেন তাহার জন্য এক আলোকময় জীবনরাজ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। সেই রাজ্যের সুখ সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়া অতুল আত্মহারা। কুহকিনী আশার দারুণ প্রলোভনে ভুলিয়া, বালক ভাবিতেছিল জগৎ সংসারকে সুখময় করিতে, সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিতে সে বলীয়ান। তাহার মানস পাখী আশার কুহকে ভুলিয়া, দুরাশা বিমানে উড়িতে উড়িতে, কখন নন্দন কাননের শোভা দেখিত; কখন আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্রে কত যশ, কত অমানুষী কার্য্যকলাপ দেখিয়া, বালক বর্ত্তমান ভুলিয়া যাইত। সাধারণ মানুষের

যাহা দুরাশা, অতুলের আশা লক্ষ্য তাহা অপেক্ষা অধিক। বালক কি তখন বুঝিত, কল্পনা কেবল মানুষকে ভুলায়—দেয় না? বালক কি তখন বুঝিত, এ অমানুষী কল্পনা রাজ্য ছাড়িয়া, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে তাহার দারুণ কষ্ট হইবে? মানুষ যাহা পায় না, মানুষ যাহা পাইবে না, বাল্য হইতে অতুলের জীবন সেই আকাশ কুসুম লক্ষ্যে ধাবিত।

পাঠকবর্গ জানিয়াছেন অতুল বাল্যকাল হইতেই নাটক নভেলে কিছু বেশী মাত্রায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। এ অসাময়িক মনোনিবেশে বাল্য হইতেই তাহার মনোরাজ্যে এক সৃষ্টিছাড়া ভালবাসার ধারণা সৃষ্ট হইল। নাটক নভেল মানুষ ও প্রকৃতি চরিত্রের চিত্র। পাঠকের রুচি ও মনের গতি অনুসারে তাহারা ইহা হইতে আদর্শ-অবলম্বন বাছিয়া লয়; বাছিয়া লইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, তাহার ধ্যান করিতে থাকে। পাঠক! আপনাদের পায় পড়ি, অতুলের প্রতি দোষারোপ করিবেন না; বালক হাতে মিষ্ট পাইয়াছে; সে বাছিয়া বাছিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব কল্পনার সৃষ্টি করিল। এ কল্পনায় তাহার শিক্ষার কোন ক্ষতি করিল না ববং তাহাতে উৎসাহ, উদ্যম ও পবিত্রতার বেগ আরো বাড়াইয়া দিল। এখন ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবেই বালকের আত্মবিস্মৃতি হইল।

চৈত্র মাস একদিন রাত্রিতে অতুল পড়িয়া শয়ন করিল। নিদ্রার অচেতনাবস্থায় স্বপ্নে দেখিল, তাহার খুড়ীমা যেন নিকটে দাঁড়াইয়া "বাবা অতুল" বলিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। অতুল চক্ষু মেলিয়া চাহিল; চাহিয়া দেখে সে স্নেহ মূর্ত্তি যেন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আর শুইয়া থাকিতে পারিল না; উঠিয়া বসিল। বসিয়া, দেখে, ঘরে অপর কিছু

নাই, কয়েকটী বালক ঘুমে অচেতন হইয়া রহিয়াছে। একটী বালকের শিয়রে একটী প্রদীপ ছিল; তাহার প্রতি বালকের অনুগ্রহ হওয়াতে, উহা তাহার মুখে পড়িয়া, শিশুর সরল মুখখানা তেল্‌তেলে হইয়া রহিয়াছে। অতুল তাহাদিগকে জাগাইয়া একথা বলিল; তাহারা বিশ্বাস করিল না। সে রাত্রি আর তাহার ভাল ঘুম হইল না। কষ্টে রাত্রি কাটাইল। মনে ভাবিল খুড়ীমা তাহার জন্য সর্ব্বদা ভাবেন, তাহাতেই এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে। পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই অতুল খুড়ীমাকে একখানা চিঠি লিখিল।

কয়েকদিন পর বালকেরা যেন গোপনে কি আলাপ করিত। অতুল নিকটে আসিলে তাহাদের আলাপ থামিয়া যাইত। বালকের মনে সন্দেহ হইল—না জানি বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইত না। জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ কিছু বলিত না, তাহারা নানা কথা বলিতে থাকিত। শুনিয়া অতুলের সন্দেহ আরো বাড়িল। এ সময় বালকের কোমল হৃদয়ে যে কষ্ট, যে উদ্বেগ, তাহা বর্ণন করিতে আমরা অক্ষম। পাঠক পাঠিকার বাল্যাবস্থায় যদি কাহারও অদৃষ্টে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহারা আপনা হইতেই অতুলের সে সময়ের হৃদয়ের অবস্থা সম্যক অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

কয়েক দিন চলিয়া গেল। একদিন অতুল দেখিল, তাহার বিছানার উপর একখানা চিঠী পড়িয়া আছে। চিঠীখানা তাহার খুড়ার। কত কি ভাবিতে ভাবিতে, কত কি ভয়ের সহিত, বালক চিঠী খুলিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক পংক্তি পড়িয়াই আর পড়িতে পারিল না; চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পড়িল। সংসারে তাহার জন্য স্নেহের যে শেষ অবলম্বন ছিল, বিধাতা তাহাও কাড়িয়া লইয়াছেন। মুমূর্ষু পিতার

অঙ্ক হইতে যে স্নেহময়ী তাহাকে আপন হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন; যে স্নেহময়ী তাহাকে মাতৃবিয়োগ বুঝিতে দেন নাই; সেই স্নেহময়ীও তাহাকে সংসারে ফেলিয়া পালাইলেন,—খুড়ীমা আর নাই। খুড়ীমাও মরিয়াছেন। বালক এ আঘাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ছেলেরা তাহাকে কত সান্ত্বনা করিল। কিন্তু অতুল খুড়ীমার স্নেহ মনে করিয়া, তিনিই যে, তাহার মা ছিলেন, একথা মনে করিয়া, বড় কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বড় কাতর হইয়া পড়িল। অতুল কতকদিন স্কুলে যাইতে পারিল না।

বিস্মৃতি জীবের মঙ্গলার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে। সে বিস্মৃতিই জীবের সুখ দুঃখ সমভাবে থাকিতে দেয় না। বিলম্ব হইল বটে—কিন্তু ক্রমে ক্রমে অতুলের শোকাবেগ কমিয়া আসিতে লাগিল।

ভুবন মোহন রায় স্ত্রীকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার যে দুঃখ, তাহা তুমি আমি কেমন করিয়া বুঝিব? তাঁহার হৃদয় এত উতলা হইয়া পড়িল যে, তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। প্রকৃতির নিয়ম চলিবেই চলিবে। তাঁহারও শোকাবেগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। অতুল বাড়ী আসিলে পিতৃব্য তাহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এখন অতুল ক্ষণকালের জন্যও পিতৃব্যের কাছ ছাড়া থাকে না।

এসংসারে এখন গৃহিণী নাই। গৃহিণী শূন্য সংসার জল শূন্য তটিনীর ন্যায়। সংসারের লোকগুলি যেন জল শূন্য বালুরাশি, উদাস ভাবে ছাড়াছাড়ি হইয়া রহিয়াছে। এরূপ উদাস ভাবেই কয়েক মাস সংসারের কার্য্য চলিয়া গেল। পাড়ার লোক নিত্য আসিয়া, আবার বিবাহ করিবার জন্য, ভুবন মোহন রায়কে উপদেশ দিতে লাগিল। তাঁহার বয়স পঞ্চাশেরও উপর। তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত

হইলেন না। অনেকের লাভের মুখে কাঁটা পড়িবার উপক্রম; পুরোহিত আসিয়া, এক শ্লোক ঝাড়িয়া প্রমাণ করিলেন "সন্তানহীন লোক স্বর্গে যাইতে পারে না, তাহার হাতের জল অশুদ্ধ।" বিধবারা প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই সকলের অগ্রগামী—পাড়ার কয়েকটী বয়স্কা বিধবা আসিয়াও জুটিলেন। তাঁহারা রামায়ণ হইতে, মহাভারত হইতে, শিশুবোধক হইতে, কৃষ্ণের শত নাম হইতে কত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কত পুরাণের কথা, কত নূতনের কথা বলিলেন। এমন কি, সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন "মরণের সময় স্ত্রীর মুখ না দেখিলে স্বর্গলাভ হয় না। দেবাদিদেব যে মহাদেব, তিনিও স্বয়ং স্ত্রীর পদতলে পড়িয়া থাকিয়া, অবিরত তাঁহার মুখ দেখিতেছেন। আপনি আবার বিবাহ করিতে কখনও অসম্মত হইবেন না। কখনও অসম্মত হইবেন না। ত্রিসংসারে ইহাপেক্ষা পাপ নাই।" ধোপা, নাপিত, মুদী, পশারি প্রভৃতি, পোষ্যবর্গ হলপ করিয়া এ বিষয়ের দৃঢ় সাক্ষ্য প্রদান করিল। মুদি বলিল সে ইহা চাক্ষুষই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভোলানাথ বাবু বলিলেন "ইহা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কৃৎ প্রকরণে আছে। রঘুর পঞ্চম স্বর্গেও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।" গ্রামে প্রকাশ অতুল বিপিন হইতে পড়া শুনায় ভাল চলিয়াছিল। বিপিনের পিসী বলিলেন—

"ভাই বল্ বন্ধু বল ঝিয়ের মা ই সার,
চোক্ বুজে চেয়ে দেখ সকলি আঁধার।"

"অতুল পরের ছেলে, তাহাতে কি বিশ্বাস আছে? বনের পাখী খাঁচা ভাঙ্গিয়া উড়িয়া গেলেই গেল। পরের ছেলে মানুষ করা আর বনের সাপ পোষা সমান।"

দশ চক্রে ভগবান ভূত—সকলের উপদেশ বাক্যে ভুবন রায়ের মন

ফিরিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

স্মৃষ্টি রাজ্যের জীব মাত্রের নিকট হইতেই আমরা কিছু না কিছু শিক্ষা করিতে পারি। পিতা মাতা যেমন সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রকৃতির আদেশানুসারেই সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তদ্রূপ সন্তানের নিকটও পিতামাতার শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। বৃদ্ধ! তোমার একটী বালিকা আছে। সে বালিকা যখন তোমাকে বাবা সম্বোধনে তোমার কোলে আসিয়া বসে, তখন তোমার প্রাণ স্নেহ ও পবিত্রতায় অনুপ্রাণিত হয়। তখন সে বালিকা তোমাকে শিক্ষা দেয় বাবা গো! আমাকে দেখিলে যেমন তোমার হৃদয় স্নেহে আকুল ও পবিত্র হয়, আমার মত অপর বালিকা দেখিলেও তোমার প্রাণ তদ্রূপ হওয়া উচিত। আমাকে দেখিয়া, তুমি সংসার শুদ্ধ বালিকাকে ভাল বাসিতে শিখিবে, ইহাই ঈশ্বরের উপদেশ। তাহাদের প্রতি প্রেমদৃষ্টি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।" ভুবন মোহন রায় তাহা ভাবিলেন না। তাঁহার বিবাহের জন্য পাত্রীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল।

মতিগঞ্জের নিকট কেশবপুর নামে এক খানা গ্রাম ছিল। তথায় এক বৃদ্ধা পিতামহী বাস করিতেন। বৃদ্ধার নাম, অথবা অন্য কোন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন বলিয়া আমরা জানি না; তাহাতেই তাঁহাকে আমরা পিতামহী বাক্যেই অভিহিত করিলাম। পিতামহী ঠাকুরাণীর পরম সুন্দরী একটী নাতিনী ছিল। তাহার নাম কাদম্বিনী, বয়স চৌদ্দ বৎসর। গরিবের মেয়ে বলিয়াই বালিকার বিবাহের বয়স কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। ধনীর হাতে পড়িলে নাতিনীটী সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবে; নিজেরও অন্ন বস্ত্রের একটা উপায় হইবে; তিনি ভুবন মোহন রায়ের নিকট কাদুকে বিবাহ দিবেন বলিয়া স্বীকৃত

হইলেন। কাদু লেখা পড়া জানিত না; এখন কার মেয়েদের মত তাহার সাহস ছিল না; সে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিল না। রূপ গুণ থাকিলেও অনেক গরিবের বালিকা এরূপ ভাবেই উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

কাদম্বিনীর সহিত ভুবন মোহন রায়ের বিবাহ হইয়া গেল। কাদম্বিনীর রূপে ভুবন মোহন রায় মুগ্ধ হইলেন। পিতামহী ঠাকুরাণীর সম্পত্তির মধ্যে একটী গরু ও একটী কুকুর ছিল। তিনি গরুটিকে নয় টাকায় বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিলেন। পরে গ্রামের শ্রীপাট তুলিয়া, নাতিনীর বাড়ী আসিয়া নঙ্গর ফেলিলেন। ভুবন মোহন রায় তাঁহাকে স্ত্রী খরিদের ফাও স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কুকুরটী চিরকালের ভদ্রাসন ছাড়িয়া আসিতে চাহিল না; কতক দিন ছাড়া ভিটায়ই পড়িয়া রহিল। কাদম্বিনী তাহাকে পুষিয়া ছিল; যখন বুঝিল এ বাড়ীতে আর সে আসিবে না; তখন পেটের দায়ে সেও আসিয়া ভুবন মোহন রায়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:—:০:—:—

বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা, আর সংসার ত্যাগী মহাযোগীর পরমব্রহ্ম উভয়ই সমান। মহাযোগী যেমন পরমব্রহ্মে লীন হইবার জন্য কায়-মনোবাক্যে সযত্ন; বৃদ্ধও তদ্রূপ যুবতী ভার্য্যায় লীন হইবার জন্য সযত্ন। এখন আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইল না; গুরু পুরোহিতের উপদেশ লইতে হইল না; ধোপা নাপিতের অনুরোধের অপেক্ষা

করিতে হইল না ; এখন অল্প দিনের মধ্যেই ভুবন মোহন রায় কাদম্বিনী গত প্রাণ হইয়া পড়িলেন। কাদম্বিনী যুবতী, রূপসী। এখন সে ভুবন মোহন রায়ের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গফলসাধিকা।

বিশেষ পরিবর্ত্তন ভিন্নই দুই বৎসর চলিয়া গেল। ভুবন মোহন রায় অতুলচন্দ্রকে বিবাহ করাইবেন। এখন তিনি নিজে কর্ত্তা নন্। কাদম্বিনীর নিকট আবেদন উপস্থিত। গৃহকার্য্যের সুবিধা হইবে ; কাদম্বিনীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইল।

পিতৃব্যের ইচ্ছা—বঙ্গ সংসারে অনেক প্রাচীনেরই এরূপ ইচ্ছার বিকার হইয়া থাকে, ভ্রাতষ্পুত্রকে একটী বালিকা বধূ বিবাহ করাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবেন।

অনেক স্থলে ছোট মেয়ের অনুসন্ধান হইল। অতুল অনেক মেয়ের রূপ গুণ জানিতে পারিয়া, বড় ব্যাদপী করিয়া, অনেক সম্বন্ধ ফিরাইয়া দিল ; বিবাহ করিতে চাহিল না। বৃদ্ধদের মধ্যে এ জন্য তাহার বড় দুর্নাম রটনা হইল। অবশেষে ভুবন মোহন রায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া, অপরিণত বয়স্কা একটী বালিকাকে ভ্রাতষ্পুত্রের জন্য মনোনীত করিলেন। অতুল তাহার এক সমবয়স্ক যুবকের নিকট লিখিয়া জানিতে চাহিল। যুবক ও শুনিয়াই অতুলের চিঠীর উত্তর দিল—মেয়ে রূপে লক্ষ্মী, গুণে স্বরস্বতী তুল্যা। তখনকার সমাজ এত অগ্রসর হয় নাই ; অতুল আর বালিকাকে দেখিবার সুবিধা পাইল না। বন্ধুর চিঠির উপরে নির্ভর করাতেই, এ সম্বন্ধে তাহার কোন অসম্মতি রহিল না। প্রকারান্তরে পিতৃব্যও তাহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া, এই সম্বন্ধই স্থির করিলেন।

বিবাহের সমুদয় স্থির। কত উৎসাহে, কত আশা ভরসায় অতুল ছুটী লইয়া বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিতে গঙ্গা পার হইয়া আসিল কি যমুনা পার হইয়া আসিল, পথে ঝড় হইয়াছিল কি তুফান হইয়াছিল,

অতুল তাহার দিকে বড় একটা দৃষ্টি করিল না। কল্পনার সুখময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে পথের যত কিছু ভুলিয়া গেল। একবার মনে ভাবিল তাহার ভাবী বধূ খুব প্রতিভা সম্পন্না। আবার ভাবিল সে বড় সরলা ও মধুর প্রকৃতি। অবশেষে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, বধূটী কেবলই সরল, সংসার জ্ঞানে অজ্ঞ, কেবল ভাল বাসিতেই জানে। হৃদয়ে আর সুখ ধরেনা! মন ত আগেই গলিয়া গিয়াছে। কল্পনার উদ্বেলিত হৃদয়, বর্ত্তমান ভুলিয়া, ভবিষ্যতের আলোচনায় নিযুক্ত হইল। স্ত্রীর ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হইয়া, সে সংসারে কত সুখ সাধন করিবে, জগতকে কত ভাল বাসিবে, ভুলেও পাপ কার্য্যে পদার্পণ করিতে পারিবে না, এ সমস্ত যুবক একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিল। সংসারে সে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিবে; হৃদয় এক নূতন বলে বলীয়ান হইবে; তাহার পবিত্র সুখের সীমা থাকিবে না; এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যুবক একেবারে উৎসাহে অধীর হইয়া পড়িল।

মুদির পসার, ধোপার পসার, গুরু পুরোহিতের পসার, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর উদরের আশ্বাস—বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত। বধূটী গৃহে আনীত হইল। ধুমধামের সহিত অতুল চন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু সে দিন হইতে অতুলচন্দ্র বুঝিল, কবির কল্পনা মিথ্যা। কাব্য সুন্দরীরা কল্পনার ছায়া মাত্র। যে সে কল্পনায় সহানুভূতি করে, সে নিতান্ত পাগল, সে নিতান্ত অপদার্থ, সে নিতান্ত মূর্খ। আজি হইতে অতুল চন্দ্রের আশা ভরসা কমিয়া হৃদয় বড় ঘোলা হইল। বিবাহ করিয়া তাহার দুরাশা সাগরের বিন্দুমাত্র স্থানও পূর্ণ হইল না। আমার পাঠক পাঠিকা, অতুলচন্দ্রকে অপদার্থই মনে কর, আর বাতুলই ভাব, বিবাহের পর হইতে দুর্ভাগ্যার উন্নতির স্রোতেও বাধা পড়িল। এটা অবশ্য খুব মন্দ; সে বুঝিল সংসারে তাহার জন্য আর সুখ নাই। দুর্দ্দমনীয়

দুরাশা একেবারে প্রতিহত হইয়াছে। সে স্থান তদ্রূপ বেগবিশিষ্ট নিরাশায় অধিকার করিয়া বসিল।

অন্যের হইলে সোহাগের ধন হইত; কিন্তু বিবাহের পর হইতেই বধূটী যেন অতুলের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সে ভাব দূর হইল না, সে বধূটীকে নিতান্ত অনাদর করিতে লাগিল। একবার ভাবিয়া দেখিত না, বুঝিতেও পারিত না, বালিকার কি দোষ। এগার বৎসরের বালিকা, তাহার হৃদয় এখনও অপূর্ণ। এখন পর্য্যন্ত প্রণয়ের প্রচণ্ড বেগ, ভালবাসার উন্মত্ততা তাহার হৃদয়ে সম্পূর্ণ ক্রিয়া করিতে পারে নাই। তথাপি বালিকা অপরিণত বয়সে বালিকার ন্যায়ই অতুল চন্দ্রকে ভালবাসিতে লাগিল। বালিকা অতুলকে পাইয়া সুখী। বালিকা হইলেও অতুলকে দেখিয়া সে সুখী। সে কখন দুরাশা হৃদয়ে প্রতিপালন করে নাই। বঙ্গ বালিকা তাহা জানে না। বঙ্গ বালিকার হৃদয় অন্য উপকরণে গঠিত। সে হৃদয়ের স্তরে স্তরে কেবল আত্মোৎসর্গ। পিতা মাতা যাহার পায় ফেলিয়া দেন, তাহাকে পাইয়াই সুখী—তাহাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়া সুখী। হৃদয়ের ভালবাসা, হৃদয়ের ভক্তি, হৃদয়ের যত কিছু, হৃদয়সহ তাহাকেই একেবারে ঢালিয়া দেয়। আপনার প্রতি তাহারা আর আপনাদের কোন অধিকার রাখে না। কিন্তু বালক স্বাধীন। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে সে সক্ষম। যৌবনের বীজ অঙ্কুরিত হওয়া মাত্রই, হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়ে কত দুরাশা পরিপোষণ করে; কাজেই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে, হৃদয়ে বিষম নিরাশার উদ্রেক হয়। অতুলের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। সে শৈবালকে ভাল বাসিতে পারিল না। বরং কতক দিন নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিল। অতুলের চক্ষে যে, শৈবালে কোন অভাব ছিল না এরূপ বলিতেছি না। শৈবাল শিল্পীর তুলিকা

চিত্রিত অথবা উপন্যাস বর্ণিত কল্পনার সুন্দরী নয়। উপন্যাস অধ্যয়ন-রত উনবিংশ শতাব্দীর নব যুবকের রূপ লালসা সে সৌন্দর্য্যে কেমন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? অতুলের হৃদয় বিজলীর সৌন্দর্য্য লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, প্রভাত সূর্য্যের শীতল কিরণ তাহাকে কেমন করিয়া তৃপ্ত করিবে? শুদ্ধ কল্পনার জগতই যাহার চিন্তার লক্ষ্য, কার্য্যকরী জগতে তাহার তৃপ্তি কম। যতদিন উন্মত্ততা হৃদয়ে বিরাজমান, ততদিন সে বুঝিতে পারে না—কাল্পনিক জগৎ কেবল নিশার স্বপ্ন, তাহার অস্তিত্ব কার্য্য জগতে নাই। যদিও অতুলের ইচ্ছা নয় ইহা সকলে জানুক, তবু পাঠকের কাণে কাণে আমরা তাহার এই দোষের কথাটী কহিলাম। আপনারা সাবধান কাহাকে এ কথাটী বলিবেন না। অতুল জানিত রূপ অপেক্ষা গুণের অধিক আদর হওয়াই বিধেয়। তবে কেমন করিয়া সে শৈবালকে ঘৃণা করিবে? আমরা অতুলের অন্তরের অন্তর দেখিয়াছি; তাহাতেই তাহার এই অসন্তুষ্টি টুকু বুঝিতে পারিয়া, পাঠকদিগকে গোপনে জানাইলাম।

কতক দিন সরল বালিকা অতুলের এই অসন্তুষ্টি বুঝিতে পারিল না। অতি বাল্যেই অতুল চন্দ্র তাহার চক্ষে বড় সুন্দর লাগিয়াছে। বাল্যেই সে অতুল চন্দ্রে মুগ্ধ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর অতুল তাহার নিকট আরো সুন্দর হইয়া দাঁড়াইল। ভালবাসারও স্রোত ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। বালিকা আর কিছু চায় না, চায় কেবল অতুলকে। অতুলকে [illegible] কথা কহিতে শুনিলেই তাহার হৃদয় উন্মত্ত হয়। যদি কখন অতুল "শৈবাল" বলিয়া ডাকে, সে ভাবে "সংসার এমন সুন্দর কেন?"

তবে অতুল কি শৈবালকে চিরদিনই অবহেলা করিত? না গো না। সংসারে এমন লোক নাই এমন কঠোর নাই যে, শৈবালকে চিরদিন

ঘৃণা করিতে পারে। শৈবালের হৃদয় বড় সুন্দর, বড় সরল, বড় মধুর। বড় মধুর উপাদানে তাহার হৃদয় গঠিত। একবার যে দেখিয়াছে, সে বুঝিয়াছে, বালিকা হইলেও শৈবালের হৃদয় কত উচ্চ, কত মহৎ। যে একবার দেখিয়াছে সে বুঝিয়াছে শৈবালের হৃদয় বাল্যকাল হইতেই কত স্নেহপ্রবণ। অতুলচন্দ্র নির্ব্বোধের ন্যায় কতবার প্রকাশ্যে শৈবালের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছে, ঘৃণা-প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্গ কুলবধূ শৈবাল ভাবিয়াছে সকলের স্বামীই এইরূপ করিয়া থাকে; এটা স্বামীর কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে কি? মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মন এইজন্য দুঃখিত হয় নাই। বরং পরক্ষণেই প্রাণভরা হাসি হাসিয়া, হৃদয় খুলিয়া, অতুলের সহিত কথা কহিয়াছে। অতুল তাহার হৃদয় দেখিয়া, আপন কার্য্যের জন্য আপন হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে।

এখন শৈবাল একটু বড় হইয়াছে। এখন তাহার অন্তর বুঝিবার কতকটা জ্ঞান হইয়াছে। অতুল পূর্ব্ববৎ কঠোর ব্যবহার না করিলেও, শৈবালের মনে লইতে লাগিল, তাহার স্বামীর স্নেহে যেন কিসের অভাব রহিয়াছে। তাহার হৃদয় যাহা চায়, সে যেন তাহা পায় না। অবশেষে অতুলকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, সে অতুলের উপযুক্ত নয়।

শৈবাল একদিন হাসিয়া হাসিয়া——মাথারদিব্বি দিয়া বলিতে পারি, প্রাণভরা হাসিমুখে অতুলকে বলিল "তুমি কেন আমাকে বিবাহ করিলে? এসংসারে তুমি কত রত্ন পাইতে। তোমার অদৃষ্টে রত্ন নাই, তুমি আর একটী বিবাহ কর। আমি তাহাকে কত ভালবাসিব, কত স্নেহ করিব।" অতুল আপন হৃদয়ের নিকট আপনি বড় লজ্জা পাইল। পাষাণ আর পারিল না, পাষাণ গলিল। অতুল শৈবালকে একেবারে বুকে টানিয়া লইয়াছে। বুকে টানিয়া লইয়া, স্নেহভরে

আজি অতুল শৈবালের মুখ চুম্বন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শৈবাল স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ভুলিয়া, আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। শৈবাল আজি অতুলের হৃদয় পাইয়াছে; সে আর এখন আপন সুখের পরিমাণ করিতে পারে না। অতুল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এরত্নের হৃদয়ে আর কখনও কষ্ট দিবে না। অতুল শৈবালকে তদবস্থায়ই বুকে রাখিয়া বলিল "শৈবাল, আমি আবার তোমাকেই বিবাহ করিব। তুমি তোমাকেই খুব ভালবাসিও, খুব স্নেহ করিও।" এই বলিয়া আবার সেই চিন্তার বহির্ভূত, কল্পনার অতীত চুম্বন। বালিকা কি করিবে কিছু স্থির করিতে পারিল না। ছি! শৈবাল চক্ষে জল কেন? ছি! শৈবাল, চক্ষের জল ফোঁটা মুছিয়া ফেল।

তবে কি শৈবলিনীর প্রতি বাস্তবিকই অতুলের প্রেম সঞ্চার হইয়াছে? ইংরাজীতে যাহাকে Love বলে, তাহার অর্থ প্রেম হইলে, শৈবালের প্রতি অতুলের সে প্রেম সঞ্চার হয় নাই। ইংরাজী ভাষাতে যাহাকে Pity বলে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ বলিবেন, শৈবালের প্রতি অতুলের সেরূপ দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র। আমরা বুড়া হইয়াছি, আমাদের প্রেম সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ। তোমরা যাহাকে Love নামধেয় প্রেম বল, তাহাকে আমরা উন্মত্ততা বলি। যাহাকে Pity আখ্যা দেও, তাহাকে মুগ্ধতা বলি। প্রথমটী নয়নের, অপরটী মনের। প্রথমটী অল্পকাল স্থায়ী, দ্বিতীয়টী চিরস্থায়ী। একটী রূপজ, দর্শনানুভবে তাহার সৃষ্টি; অপরটী গুণজ, জ্ঞানে তাহার জন্ম। একটী সন্তরণ, ভাসা ভাসা থাকে; অপরটী নিমগন, একবারে অতল তলে ডুবিয়া যাইতে হয়। একটী মদের নেশা, পান করা মাত্র মাতাল হইতে হয়, ছাড়িয়া যাইতে বিলম্ব হয় না; অপরটী অহিফেণের নেশা, ধীরে ধীরে বাড়িয়া, প্রাণকে জব্দ করিয়া, পরে তাহা লইয়া টানাটানি করে।

কল্পনার শিশু অতুল প্রথমের পক্ষপাতী হওয়াতে শৈবালের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ও শান্তগুণে তাহাকে উন্মত্ত করিতে পারে নাই। কাযেই তাহাতে সে সুখী হইতে পারে নাই। কিন্তু এক একদিন শৈবালের এক একটী ব্যবহারে অতুল মুগ্ধ হইয়া পড়িত। চঞ্চলতার অধীন বলিয়া, পরক্ষণেই আবার উন্মত্ততার পক্ষপাতী হইত। যদি কল্পনা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অতুল পার্থিব রাজ্যে বিচরণ করিত; তাহা হইলে বুঝিতে পারিত শৈবলিনী রত্ন জগতে কিরূপ দুর্লভ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অতুল চন্দ্র মাতৃহীন, শৈবালও মাতৃহীন বালিকা। সাত বৎসর বয়সের সময় তাহার মা মরিয়াছেন। পিতা জন্মের দুই বৎসর পর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। পাড়ার মেয়েদের কেহ বলিত তাঁহাকে সুন্দর বনে বাঘে খাইয়াছে; কেহ বলিত তাঁহাকে ডাকাতে মারিয়াছে; কেহ বলিত তিনি বৃন্দাবন যাইয়া, একটী অসৎ চরিত্র মেয়ে মানুষকে বিয়ে করিয়া, সেখানে বাস করিতেছেন। মূল কথা তাঁহার সম্বন্ধে কেহই কিছু স্থির অবগত ছিলনা।

মার মৃত্যুর পর শৈবাল একটী আত্মীয়ার নিকট প্রতিপালিত হয়। দুই বৎসর যাবৎ সেও মরিয়াছে; পিতৃকূলে শৈবালের কেহ লক্ষ্য নাই।

কতক দিন নির্ব্বিরোধে সংসার চলিল। কিন্তু পরে কাদম্বিনী— জানিনা কেন, শৈবালকে দেখিতে পারিত না। শৈবালের দোষ সে

কোমল, শান্ত, ধীর। কাদম্বিনীর গুণ সে আত্মম্ভরী, রুক্ষস্বভাব, উগ্র-মূর্ত্তি। শৈবালের আর এক দোষ, সে ঘরের একমাত্র বধূ; কাদ-ম্বিনীর আর এক গুণ, সে গৃহের গৃহিণী, অকালে অকাল-গৃহিণী—সংসারের একমাত্র কর্ত্রী। শৈবালের অন্য দোষ, পূর্ব্বে অতুল তাহাকে দেখিতে পারিত না, এখন একটু দেখিতে পারে। কাদম্বিনীর অন্য গুণ, বৃদ্ধের ভার্য্যা, বিবাহের পর হইতেই স্বামীর অতিরিক্ত আদরে যথেচ্ছাচারিণী। যুবতী-সুলভ নম্রতা, রমণী-সুলভ লজ্জা, তাহাতে আর নাই। তরুণ বয়সেই বৃদ্ধাদের দোষগুলি তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। এ কিসের পরিণাম। অসংলগ্ন বিবাহ জনিত এ পরিণাম; সমাজকে বলি, আর কিছুরই নয়। অন্ধ সমাজ চাহিয়া দেখুক—যে ফুল উপযুক্ত জল. তাপে সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারিত; সংসারকে সৌরভ-ময় করিতে পারিত; সেই ফুলের কি পরিণতি হইল! কীট দংষ্ট্রের ন্যায়, আতপ দগ্ধের ন্যায়, তাহা এখন সৌন্দর্য্য হীন, সৌরভ হীন। সমাজ বুঝুক অসংলগ্ন ব্যবহারে কুসুমও বিষ উদ্গীরণ করে।

দোষে গুণে মিশিবে কেমন করিয়া? তাহাতে আবার পিতামহী ঠাকুরাণী শিক্ষয়িত্রী। কাদম্বিনী শৈবালে মিশিতে পারিল না। ক্রমে এ পার্থক্য আরও বিস্তৃত হইয়া দাঁড়াইল। সংসারের মধুরতা দূর হইয়াছে। কাদম্বিনী কখন মিষ্ট মুখে শৈবালের সহিত কথা কহিত না। সে শাশুড়ী শৈবাল ঘরের বধূ। শৈবালকে সে শাসন করিবে, শৈবাল তাহা কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, ইহাই সমাজের নিয়ম। তর্জ্জন গর্জ্জনময়ী কাদম্বিনী বিনাদোষে বধূকে অবিরত শাসন করিয়া কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে লাগিল। অল্প বয়সেই শাশুড়ী। সে কর্ত্তৃত্ব দেখাইবে না কেন? দিন চলিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শাশুড়ীপণা, গৃহিণীপণাও চলিতে লাগিল। মানুষের প্রাণ—বিশেষতঃ বালিকার প্রাণ বইত নয়; এ নিত্য নৈমি-

ত্তিক বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন, বৃথা গালিবর্ষণ, বালিকা শৈবাল আর সহ্য করিতে পারিল না। বালিকার মুখ ফুটিল। কাদম্বিনী বালিকার মুখ ফুটাইল। প্রতিদিন এরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া, শৈবাল একদিন শাশুড়ীকে বিরক্ত ভাবে বলিল "আপনি গালি ভিন্ন কথা কহিতে জানেন না? আমি কি অপরাধ করিয়াছি? ক্রটী দেখিলে বলিয়া দিলেই হয়, আর করিব না।" কথার প্রত্যুত্তর দিয়াছে, বিশেষতঃ শাশুড়ীর কথার প্রত্যুত্তর; কাদম্বিনীর ক্রোধাগুণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। শৈবালকে যথেচ্ছা গালাগালি করিল। ভুবন মোহন রায়ের নিকট বধূর কত অপবাদ রটনা করিল। বধূকে শাসন করিতে পারে না বলিয়া, অতুলকে লক্ষ্য করিয়াও তিরস্কার করিতে ক্রটী করিল না। এইরূপে সংসারে আগুণ লাগিল, সংসারের সুখ শান্তি একেবারে লোপ হইবার উপক্রম হইল। অতুলচন্দ্র বৃথা তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া, শৈবালকে যথেষ্ট তাড়না করিল।

পাঠক! বঙ্গ সংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিও; দিবা দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ আহারের পর যখন পাড়ার বিধবারা একত্র বসিয়া, পরনিন্দা রূপ অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হয়; তখন যাইয়া চুপি চুপি শুনিও, অনেক শাশুড়ী, অনেক গৃহিণী প্রাণ ভরিয়া আপনাদের বধূগণের নিন্দাবাদ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন "বউটা কথায় কথায় জবাব দেয়, এমন বউত আমি বিশ্ব বাঙ্গালায় আর দেখি নাই।" কেহ কহিতেছেন "বউটা বড় বেয়াড়া হইয়া পড়িয়াছে যে; এই বউকে কি আমি শাসন করিতে পারি?" কোন সুন্দরী বলিবেন "বউটা ভাতারের কাছে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, সেই রূপই শিক্ষা করিয়াছে।" তদুত্তরে কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বধূদের কুনীতি ও কুরীতি শিক্ষার মূল কারণ কাহারা? বধূদের বিবাদ প্রিয়তার কারণ কি? তাহারা কেন শাশুড়ী-

দের অবাধ্য হইয়া পড়ে ? বঙ্গ সংসারে যত নববধূ আনীত হয়, তাহাদের সকলেই বালিকা। সকলেই মনের অপরিণতাবস্থায় স্বামী গৃহে আনীতা হয়। তাহাদের যত কিছু শিক্ষা, যত কিছু দোষ গুণ, সকলই স্বামীগৃহে আসিয়া হয়। সংসারে গৃহিণীই তাহাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। গৃহিণীর দোষগুণ সম্পূর্ণ রূপে বধূদিগকে আশ্রয় করে। গৃহিণী চরিত্র বধূচরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। যে গৃহিণী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, বালিকা বধূদের কোমল হৃদয় বাল্যেই কর্কশ করিয়া ফেলেন, তিনি কর্কশতা ভিন্ন মধুরতা সে বধূ হইতে প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যে গৃহিণী নিজে কলহপ্রিয়া, তিনি তাহার বধূর হৃদয়ে কলহ-প্রিয়তার বীজ ভিন্ন আর কিছু বপন করেন না। অনেক গৃহিণী বধূদের বিন্দু মাত্র দোষ দেখিলেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র করিয়া বধূর সুনাম একেবারে লোপ করেন। মনে ভাবেন বধূকে বড় শাসন করিলেন। নির্ব্বোধ—একবার বুঝিতে পারিলেন না, ইহাতে তাঁহার প্রতি বধূটীর ভক্তি যে, একবারে চলিয়া গেল। ইহাতে বধূটীর দুর্নাম ভয় যে একেবারে লোপ পাইল। বধূটী দিন দিন আরো মন্দ হইতে চলিল। আরো মুখরা হইতে চলিল। সংসারেও অশান্তির বীজ রোপিত হইল; অনেক গৃহিণী অলঙ্কার পূর্ণ নানা প্রকার বাক্য বিন্যাসে লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন "আমি শাশুড়ী বলিয়া এত সহ্য করি; মন হইতে সমুদয় ঠেলিয়া ফেলি; কিছু মনে রাখি না। এখন পর্য্যন্ত এত দোষ গোপন রাখিয়াছি। অন্য হইলে তিলার্দ্ধও এ বউ লইয়া সংসার করিতে পারিত না।" বাস্তবিকই যদি বধূটী মন্দ হইয়া থাকে, ও তজ্জন্য যদি শাশুড়ী কোন জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা কাহার দোষ? আমরা বলি তাহা তাঁহার আত্মকার্য্যের ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। বধূদের কোমল হৃদয়ে শাশুড়ী যে বীজ বপন করিয়াছেন, ইহা সে

বীজোদ্ভূত বৃক্ষের ফল, নিজে চয়ন করিবার জন্য নিজ হস্তে রোপণ করিয়াছেন।

অতুলচন্দ্র স্কুল বন্ধের সময় বাড়ী আসিত। বাড়ীতে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ভিন্ন কিছুই শুনিত না। পূর্ব্বে যে গৃহ শান্তিময় ছিল, এখন তাহা কলহালয়। কাদম্বিনী এখন এরূপ পরিবর্ত্তিত যে, বধূকে নির্য্যাতন করিবার মানসে, কখন শৈবালের অগোচরে তাহার কাপড়খানি ছিঁড়িয়া রাখিত। কোন সময় শৈবাল রাঁধিয়া রাখিলে, তাহার অগোচরে খাদ্যে কোন মন্দ পদার্থ মিশাইয়া রাখিত। পরক্ষণেই বধূ কাপড় ছিঁড়িয়াছে বলিয়া, খাদ্য সামগ্রীতে কোন মন্দ পদার্থ মিশাইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রতি যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিত। সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী শৈবালের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া আসিত। হতভাগিনী শৈবাল ঘরের বধূ, কোথাও যাইতে পারে না, কাহাকেও বলিতে পারে না, একা বসিয়াই অশ্রুজলে এই দুঃখের শান্তি বিধান করিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



বৈশাখ মাসের শেষে গ্রীষ্মের বন্ধ হইল। অতুলচন্দ্র বাড়ী আসিয়াছে। আজি অনেক দিন পর শৈবাল অতুলচন্দ্রকে আপনার অবস্থা জানাইল। শৈবাল এতদিন আপনার জ্বালা যন্ত্রণা আপনার হৃদয়ে রাখিয়াছে, কখনও কাহাকে কিছু বলে নাই। কাহাকে বলিবে? কাহার কাছে দুঃখভার বলিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবে? শৈবালের

সহচর সহচরী সকলেই বালক বালিকা। তাহাদিগকে আপনার দুঃখ ভার জানাইলে কি হইবে ?

পাড়ার ছোট ছোট বালক বালিকারা শৈবালকে বড় ভাল বাসিত। শৈবাল ও বালক বালিকা পাইলে বড় সুখী হইত। সে বালক বালিকাদিগকে খেলার দ্রব্য সামগ্রী দিত, কাহাকে পুতুল গড়াইয়া দিত। কাদম্বিনীর অগোচরে তাহাদিগকে কত স্নেহে খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইত। বালক বালিকারা তাহাকে কেহ খুড়ীমা, কেহ ছোট খুড়া, কেহ বউমা, কেহ নূতন বউ বলিয়া সম্বোধন করিত। একটী ছোট ছেলে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না; সে শৈবালকে "ছৈবাল খুলী" বলিয়া ডাকিত। সুন্দর স্বভাবা শৈবাল বালকের সম্বোধন শুনিয়া, একেবারে গলিয়া যাইত; তাহাকে কোলে লইয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিত, আর তাহাকে কত স্নেহ করিত। শৈবাল নিতান্ত সরল, বালক বালিকাগণ নিতান্ত সরল। সরলে সরলে সুন্দর মিশিয়াছিল।

ইহাদিগকে সংসারের কুটীল কথা বলিলে কি হইবে? তাহারা ভাবিবে শৈবাল উপকথা কহিতেছে। বালক বালিকা ভিন্ন সমবয়স্কা আরো কয়েকটী যুবতী মেয়ে শৈবালের নিকট আসিত। শৈবাল তাহাদিগকেও কখন আপনার দুঃখের কথা বলে নাই। আজি শৈবাল আর পারিল না, অতুলচন্দ্রকে বলিল "আর কেমন করিয়া এ জ্বালা যন্ত্রনা সহ্য করি ?

অতুল। "এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিও না। আমার ইহাতে কোন হাত নাই। যে পিতৃব্য আমাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন, দিন দিন তাঁহার মন হইতে দূর হইতেছি। এখন আর আমি নিয়ম মত তাঁহার চিঠী খানাও পাই না। তিনি আর আমাকে

এখন তত স্নেহ চক্ষে দেখেন না। ইহার কারণ কি? সংসারের কলহ ভিন্ন ইহার দ্বিতীয় কারণ নাই"। শৈবালের চক্ষে জল! সরল প্রতিমা আবার বলিল "আমি হতভাগিনী"; তাই তোমার এত কষ্টের কারণ হইয়াছি। আমার প্রতি বিরক্ত হইও না। ভাবিয়া দেখ দিন রাত্রি কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! কোন দিন তাহা তোমাকে বলি নাই। মনে ভাবিয়াছি তোমাকে বলিলে কি হইবে? তোমাকে বলিলে মনে কষ্ট পাইবে মাত্র। কিন্তু এখন আর না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এতদিন গালি শুনিয়াছি, তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়াছি, তাহা সহ্য করিয়াছি। কিছু বলি নাই। ক্ষমা করিও, এক দিন সহ্য করিতে না পারিয়া, মুখে মুখে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। এখন এ আগুন ঘর ছাড়িয়া পাড়ায় প্রবেশ করিয়াছে। পাড়ায় এমন লোক নাই, এমন বাড়ী নাই, যেখানে আমার মিথ্যাপবাদ রটনা করা হয় নাই। লোককে বুঝাইয়া বলিলে, লোকে ইহা বিশ্বাস করিবেনা কেন? আমি কি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিনা? তিনি শাশুড়ী, আমি ঘরের বউ। আমি তাঁহাকে মার মত ভক্তি করিব, তিনি আমাকে স্নেহ করিবেন; আমাদের এ সদ্ভাব কোথায়? সময়ে সময়ে রাগান্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তজ্জন্য কি আমার কষ্ট হয় না?"

অতুল। তুমিই না হয় সমুদয় সহ্য কর। যদি বুঝিয়া থাক, তুমি তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ। তিনি তোমার গুরুজন, তাঁহার পায় ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।

শৈবাল। কতবার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছি। কতবার বলিয়াছি; গালি দিন সহ্য করিব; প্রহার করুন সহ্য করিব; কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া মিথ্যাপবাদ রটনা করিবেন না। তিনি বুঝিতে

পারেন না, প্রতিবেশীদিগকে ইহা বলিলে কি হইবে। বরং আমাদের অসদ্ভাবের কথা শুনিয়া অনেকে সুখী হয়।

অতুল। শৈবাল, বঙ্গ সংসারের প্রতি ঘরেই কলহ। নির্জ্জীব পদার্থের সহিত কাহারো কলহ হয় না। তুমি না হয় চুপ করিয়া সকল কথা শুনিও। কোন কথার উত্তর করিও না। লোকে সংসারের সুখ সাধনের জন্য কত কি সহ্য করিতেছে। তুমি কি এ সামান্য কষ্টও সহ্য করিতে পারিবে না? আর যদি একান্তই অসহ্য হইয়া পড়ে, কাঁদিয়া তাহার শান্তি বিধান করিও। পায় পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিও "সমুদয় অপরাধ আমার, আর কখনো করিব না; আমাকে ক্ষমা করুন।" সংসারে এমন লোক নাই, ইহাতে ক্ষমা না করিয়া পারে। তিনি তোমাকে কটু কহিলে, ভুলিয়াও তাঁহাকে কটু কহিও না। হাসিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিও। তিনি কখনো রাগ রাখিতে পারিবেন না। তিনি তোমাকে বকিলে, তোমার বিরুদ্ধে কথা কহিলে, তাঁহারই বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিও; এসংসারে আবার শান্তি হইবে, সুখ হইবে। তোমাদের আবার সদ্ভাব হইবে। ক্ষমা মনুষ্যের পরম গুণ। যে অন্যকে ক্ষমা করে, ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন। সংসারে বোবার শত্রু নাই।"

এ কথা গুলি শৈবালের সুন্দর হৃদয়ে বড় সুন্দর ক্রিয়া করিল। শৈবাল একটু থামিয়া বলিল "তোমাকে বিরক্ত করিয়াছি, ক্ষমা করিও। তুমি এ কলহে মন দিও না। ইহাতে তোমার মনের শান্তি নষ্ট হইবে। আর এক ভিক্ষা, লোকে বিশ্বাস করুক, জগৎ সংসার বিশ্বাস করুক, কিন্তু তুমি ইহা বিশ্বাস করিও না। সংসারের অপবাদ আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। তোমার নিকট কখন কিছু গোপন রাখিয়াছি, কি রাখিব, তোমার মনে যেন এ সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। যে উপদেশ দিয়াছ, আজি হইতে তাহাই প্রতিপালন করিব। তোমার যেন মনের স্ফূর্ত্তি দূর না হয়। এসকল

কথা আমার আর কাহাকে বলিবার নাই। তাই বলিয়াছি; ক্ষমা কর। তুমি আমাদের এই ছাই মাটি কথাকে মনে স্থান দিও না।"

শৈবালের হৃদয়ে বিন্দু মাত্র কষ্ট নাই। শৈবাল প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া অতুলের সহিত তন্মুহূর্ত্তেই কত আলাপ করিল। আজিও অতুল বুঝিল, তাহাকে দেখিলে শৈবালের কোন কষ্ট থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না। আজি আবার অতুল শৈবালের মুখ চুম্বন করিল। আজি আবার অতুল শৈবালকে প্রাণের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দেখুন আপনারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এ পরিচ্ছেদে সংসারের বড় একটী কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আপনাদের সমক্ষে এ কুৎসিত চিত্র আঁকিলাম বলিয়া, আমাদিগকে গালি দিবেন না, আমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। এই সংসারই ভাল মন্দে পরিপূর্ণ। ভাল মন্দের মধ্যে অন্য কিছু নাই। পাপ পুণ্যের মধ্যে অন্য কিছু নাই। লোকে হয়ত ভাল অথবা মন্দ কার্য্য করিতেছে, পাপ অথবা পুণ্য করিতেছে। পাপ ও পুণ্য কার্য্য জনিত সংসারের সুখ দুঃখ, সংসারের মঙ্গলামঙ্গল। যেখানে পাপ রহিয়াছে, সেখানে দুঃখ রহিয়াছে, অনুতাপ রহিয়াছে। যেখানে পুণ্য রহিয়াছে, সেখানে সুখ রহিয়াছে, সেখানে আত্মপ্রসাদ রহিয়াছে।

সংসার কেন সুখ দুঃখে পূর্ণ? ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তিনি ইচ্ছা করিলেইত সংসারকে সুখে পূর্ণ করিতে পারিতেন। তিনি কেন দুঃখ সৃষ্টি করিলেন? ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাহাতেই ইচ্ছা করিয়া তিনি দুঃখ

সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের শিক্ষার জন্য, মনুষ্যের উন্নতির জন্য দুঃখের সৃষ্টি। দুঃখ কি? দুঃখ সুখের অভাব। দুঃখ না থাকিলে সুখ কেহ বুঝিতে পারিত না। সুখের অভাব না বুঝিলে তজ্জন্য কেহ লালায়িত হইত না। দুঃখ ভিন্ন সুখ থাকিলে এ সংসার জড়বৎ থাকিত। কাহারও চেষ্টা থাকিত না, উদ্যম থাকিত না, সংসার নির্জ্জীব রহিত। লোকে যাহা করিতেছে তাহা আর কিছু নয়; তাহা কোন বিষয়ের অভাব মোচনের চেষ্টা মাত্র। সে অভাবের মূলদেশে সুখের অভাব রহিয়াছে। মুসলমান জাতির সুখের অভাব হইয়াছিল; ভারতের প্রতি সপ্তশতবর্ষ অত্যাচার করিয়া, সে অভাব পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ইংরাজ ভারত অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের সুখের অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে। হতভাগিনী ভারতের অভাব কি, ভারত তাহা বুঝিতেছে না, তাহার মোচন করিতেও চেষ্টা করিতেছে না। ভারত নির্জ্জীব, জড়বৎ। ভারতের দুঃখ চিরকাল রহিবে কি? এ দুঃখের নির্ব্বাণ নাই কি?

আমাদের সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে আমাদের হাতে ন্যস্ত। আমরা আমাদের সুখ দুঃখের অভিনেতা। হৃদয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, কোন কার্য্যে বিমল সুখ, কোন কার্য্যে অপার দুঃখ। কোন কোন কার্য্যের ফল সন্দেহে পূর্ণ বটে, তাহাতে অদৃষ্ট ক্রমে সুখও হইতে পারে, কিন্তু দুঃখ হইবারই অধিক সম্ভাবনা। কার্য্যের ভবিষ্যৎ ফলের দিকে চাহিয়াই, আমরা ভাল মন্দ বুঝিতে পারি। যাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ সুখের প্রতি রহিয়াছে, তিনি প্রায়ই দুঃখ ভোগ করেন না। যাঁহার চক্ষু ভবিষ্যতে অন্ধ, তিনি বর্ত্তমান ক্ষণিক সুখ ভাবিয়াই মত্ত, ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্য কলাপ তাঁহাকে ভয়ানক অনুতাপ রূপ অনলে নিক্ষেপ করে।

ভুবনমোহন রায় না বুঝিয়া, ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া, বৃদ্ধ বয়সে কাদম্বিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যফল এত দিনে প্রকাশ পাইল। কাদম্বিনীর স্বভাব কলুষিত হইয়াছে।

আপনারা শুনিয়াছেন, ভুবনমোহন রায়ের বাড়ীতে একটী পাঠশালা ছিল। ভোলানাথ বাবু সে পাঠশালার গুরুদেব। ভুবনমোহন রায় ভোলানাথ বাবুকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার উপদেশ না লইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। গুরুদেব ভুবনমোহন রায়ের একমাত্র মন্ত্রী; একমাত্র বুদ্ধি দাতা। অল্প দিনের মধ্যে তিনি ভুবনমোহন রায়ের সংসারে এক জন হইয়া পড়িলেন। আপনারা জানেন, তিনি তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন; তাঁহার অন্নেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন।

ভোলানাথ ভুবনমোহন রায়ের বাড়ীতে থাকিয়া, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত হইলেন। কাদম্বিনীর হৃদয় রাজ্য অধিকার করিবার জন্য তিনি এখন সচেষ্ট। ভুবনমোহন রায় বৃদ্ধ, ভোলানাথ তত বয়স্ক নয়, দেখিতে সুন্দর, হৃষ্ট পুষ্ট। অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইল না; লজ্জার মাথায়, ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করিয়া কাদম্বিনী ভোলানাথের আয়ত্ত হইয়া পড়িল। সে এখন ভোলানাথের প্রণয়িনী। কাদম্বিনী এখন ভ্রষ্টা।

আর এক বন্ধোপলক্ষে অতুলচন্দ্র বাড়ী আসিল। বালিকা শৈবাল কাদম্বিনীর চরিত্র জানিতে পারিয়াছে। অতুলচন্দ্রকে তাহা বলিতে ইচ্ছা করিল। একবার বলিতে চেষ্টা করিল; বলিতে পারিল না; হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মনে ভাবিল অতুলচন্দ্র ইহা বিশ্বাস করিবে না। হয়ত সে ভাবিবে, শৈবাল শত্রুতা সাধিতেছে। আবার ভাবিল অতুলকে একথা বলিবে না; বলিয়া কি লাভ? শুদ্ধ তাঁহার মনে কষ্ট দেওয়া

মাত্র। তাহার কি আসিবে যাইবে? অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, বলাই কর্ত্তব্য; কেননা, অতুল যদি ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারে। পাপীয়সীদের কোন পাপ কার্য্যেই ভয় নাই; হয়ত ইহাপেক্ষাও কোন বিষম কার্য্যে কাদম্বিনী হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

শৈবাল বলিল "তোমাকে"—একথা সহজে শৈবালের মুখ হইতে বাহির হইল না। অতুল জিজ্ঞাসা করিল "কি বলিতেছিলে? থামিয়া গেলে কেন?

শৈবাল। তোমাকে একটী কথা বলি। হয়ত তোমার বিশ্বাস হইবে না। মনে ভাবিবে শত্রুতা করিয়া ইহা বলিতেছি।

অতুল। কি বলিতে চাহ বল।

শৈবাল। "তোমার খুড়ীর স্বভাব কলুষিত হইয়াছে।" অতুলচন্দ্র শিহরিয়া উঠিল; একটু বিরক্তি স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কিরূপে জানিলে?"

শৈবাল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে গুরু মহাশয়ের সহিত কুৎসিত কৌতুক করিতে দেখিয়াছি।

অতুল। সাবধান! দেখিও, আমি এখন পর্য্যন্তও একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যদি তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ না হয়, মনে ভাবিও তুমি স্বামী সুখ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলে। তখন তোমার মুখ দেখিলেও আমার ভয়ানক ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হইবে।

শুনিয়া সরলা শৈবালের কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আজি হইতে অতুলচন্দ্র ইহা জানিবার জন্য সচেষ্ট।

পাপকার্য্য কখনও গোপন থাকিতে পারে না। একদিন না এক দিন উহা জগতের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। এখন অতুল

চন্দ্রও বুঝিতে পারিল কাদম্বিনীর স্বভাব কলুষিত হইয়াছে।

অতুলচন্দ্র ভোলানাথ বাবুকে গোপনে ডাকিয়া বলিল "আপনাকে আজিই এ বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে। আমি সমুদয় জানিতে পারিয়াছি। বাল্যকালে আপনার নিকট শিক্ষা পাইয়াছি; তাহাতেই ক্ষমা করিলাম; নতুবা আপনি আমা হইতে সমুচিত শিক্ষা পাইতেন। আপনি এ গ্রামে অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না।"

শুনিয়া পাপীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অতুলচন্দ্রের ভয়ে গুরু মহাশয় সে বাড়ী ত্যাগ করিলেন। ভুবন মোহন রায় কিছু জানেন না। বাঁড়ুয্যা মহাশয়ের হঠাৎ বাড়ী ত্যাগের জন্য তিনি বড় দুঃখিত হইলেন।

অতুল মনে ভাবিল পিতৃব্যকে ইহা বলিবে। আরবার ভাবিল, তাহার প্রতি পিতৃব্যের সে ভাব নাই; তিনি হয়ত ইহা বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস করিলেই বা কি হইবে? বিশ্বাস করিলেও তাঁহার চির অসুখ সম্পাদন ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অবশেষে একথা গোপন রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার স্থির বোধ হইল। এ পাপকে গ্রাম হইতে দূর করিবার জন্য অতুল গোপনে পাঠশালার সবইন্‌স্পেক্টার প্রমদা বাবুর নিকট দরখাস্ত করিল। সবইন্‌স্পেক্টার মহাশয় ভোলানাথকে বড় ভাল বাসিতেন। ভোলানাথ ইহা জানিতে পারিলেন। কাদম্বিনীরও ইহা জানিতে বাকি রহিল না। কাদম্বিনী এখন একটু লেখা পড়া শিখিয়াছে; একটী ছোট বালকের দ্বারা ভোলানাথ কাদম্বিনীকে আক্ষেপপূর্ণ, পরামর্শপূর্ণ একখানা চিঠী লিখিয়া পাঠাইলেন। ভোলানাথের পরামর্শানুসারে কাদম্বিনী অতুলচন্দ্রের চির উচ্ছেদ সাধনের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল।

কাদম্বিনী এখন ভুবন মোহন রায়ের নিকট অতুলের নামে নিত্য নূতন অভিযোগ করিতে লাগিল। এ বেদের উপদেশে, এ ধর্ম্মের

উপদেশে অতুলের প্রতি তাঁহার মন, তাঁহার বিশ্বাস, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। এখন যদি কাদম্বিনী বলে, অতুল তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, অসন্দিগ্ধ চিত্তে ভুবনমোহন রায় তাহা বিশ্বাস করিতেন।. কাদম্বিনী তাঁহার মনে ইহাও সুন্দররূপে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, অতুলের নৈতিক চরিত্রও নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। অতুল তাঁহার মন হইতে একেবারে উঠিয়া গেল। ভূমি সুন্দর কর্ষিত হইয়াছে, এখন বীজ বপন করিলেই ফলিবে। একদিন কাদম্বিনী স্বামীকে কি বলিল, কি বুঝাইল, লোকে তাহা জানিতে পারিল না। পাঠক পাঠিকারও জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। শুনিয়া, ভুবন রায়ের কাদম্বিনী প্রতিষ্ঠিত সেই ক্রোধ, বিরক্তি, ঘৃণাগ্নি যেন পূর্ণাহুতি পাইয়া, একেবারে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দারুণ ক্রোধভরে অতুলচন্দ্রকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া তাহাকে যথেষ্ট গালি দিলেন, মারিতে উদ্যত হইলেন। অবশেষে বলিলেন "আর তোর মুখ দেখিব না। তুই এই বংশের কুলাঙ্গার। এ গৃহে আর তোর স্থান নাই। যা, এ মুহূর্ত্তেই এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যা।"

সংসারের সহিত অতুলের বন্ধন এখন পর্য্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই। ভুবনমোহন রায় তাহাকে যে জন্য তিরস্কার করিলেন, মারিতে উদ্যত হইলেন, সেই বিষময় বাক্য শুনিয়া, অতুলের মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন লোপ পাইল। পৃথিবী যেন তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত গৃহ যেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘুরিল। আজি তাহার বোধ হইল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সমস্তই যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণায়মান। অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে শব্দমাত্র নাই; অনেক বলিতে ইচ্ছা হইল, বলিল না। হৃদয়ে এমন ক্রোধ, এমন দুঃখ, এমন অভিমান জ্বলিতে ছিল যে, অতুল তাহার বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিছু

না বলিয়া, ক্রোধভরে তন্মুহূর্ত্তেই গৃহ ত্যাগ করিল। কেবল যাওয়ার কালীন উর্দ্ধে চাহিয়া, বলিয়া গেল "দেব! তুমি সর্ব্বদর্শী। পাপীর দণ্ড বিধান করিও।"

হৃদয়ের বেগে সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছিল। যাওয়ার কালীন অতুল শৈবালকে কিছু বলিতে পারিল না। শৈবালের সহিত একবার দেখা করিতে পারিল না। অতুলের হঠাৎ গৃহত্যাগ সম্বন্ধে শৈবাল সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নদীর জল কেবল চলিয়া যাইতেছে, ফিরিতেছে না। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, বীচিমালা ছুটিয়া যাইতেছে, ফিরিতেছে না। মৃদু নৈশ-বায়ু ধীরে বহিতেছে, থামিতেছে না। নদী হৃদয়ে তাহাতে অপূর্ব্ব লহরী। অন্ধকার রজনী, শেষ রাত্রিতে আকাশের কোলে অসংখ্য তারকা। নদী হৃদয়ে তাহাদের অপূর্ব্ব অপরিসীম সৌন্দর্য্য। রজনীর প্রথমার্দ্ধ হইতে এখন তাহাদের উজ্জ্বলতা অধিক—পতন ও নিকটবর্ত্তী—নিবিয়া যাইতে বিস্তর বিলম্ব নাই। নদী বক্ষে এ তরঙ্গ নাচনীতে দ্বিতীয় নৌকা নাচিতে ছিলনা; কেবল একখানা ডিঙ্গীনৌকা স্রোতবেগে উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইতেছে। শীতকালের রাত্রি, মস্তকে, কাণে, বক্ষে, পৃষ্ঠে বস্ত্র জড়াইয়া, তরঙ্গোপরি নৌকা বাহিতে বাহিতে মাঝি গাইতে ছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীগর্ভে, শেষ নিশিতে সেই অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি, সেই রাসভ-বিনিন্দিত মনোহর কণ্ঠবাদ্য, মৃদু-সমীরে

আপনাআপনি ফুটিতেছিল; আপনাআপনি মিশিয়া যাইতেছিল; দুঃখের বিষয় কেহ শুনিতে ছিলনা। কেহ তাহার তাৎপর্য্য, রস মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে সেখানে ছিলনা। শুনিতেছিল কেবল নিবস্ত তারকাবলী, আর চলন্ত জল লহরী। যিনি আরোহী,তাঁহার মনোনিবেশ এ সঙ্গীতের প্রতি নয়; তিনি নিদ্রিতও ছিলেন না; তাঁহার হৃদয় অকুল চিন্তা সাগরে নিমগ্ন। মাঝি ভাবিল, বাবু ঘুমাইতেছেন, তাহার গান শুনিতেছেন না। তাহার মধু বর্ষণ, তাহার রস ব্যয় বৃথা যাইতেছে। মাঝি শ্রোতা অভাবে কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইল। কণ্ঠস্বর বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু ঘুমাইয়াছেন কি? গান শুনিতেছেন না?

অতুলচন্দ্রের হৃদয় জাগ্রত হইল। তিনি মাঝির মন বুঝিলেন; বলিলেন "হাঁ, শুনিতেছি বইকি, দিব্বি গান, গাহিয়া যাও।"

উৎসাহে, প্রশংসা বাক্য শ্রবণে, মুখ খানা ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইল। আকাশে নক্ষত্রগণ দেখিল, শুধু তাহারাই ফুটিয়া রহিয়া ছিলনা; তাহাদের বিপরীত দিকে, তরণী বক্ষেও এক খানা কালশশী ফুটিল। এ মুখ প্রস্ফুটন, এ মসি মুখে-সমল-দশন বিকাশ কেহ দেখিল না; ইহাও আপনা আপনি ফুটিল, আপনা আপনি নিবিল। কণ্ঠ আবার অবিকতর উচ্চে রাসভ রাগ উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

এবার সে সুধাবর্ষী বিকট স্বর আপনিই অতুলচন্দ্রের মনকে আকর্ষণ করিল। অতুল মনে ভাবিল "কি সুখী, কি সহজ-তৃপ্ত।"

যদি উপায় থাকিত, যদি মনুষ্য জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, অতুলচন্দ্র সুখে সহজ-তৃপ্ত মাঝির সহিত আপনার জীবন পরিবর্ত্তন করিত।

অতুলচন্দ্র দুঃখীর সন্তান নয়। তথাপি দুঃখী। দুঃখে দেহ ঢালিয়াছে। সংসারের প্রতি বড় বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। আপন অদৃষ্ট, আপন সুখ দুঃখ লইয়া, আপনি ভাসিবে বলিয়া স্থিরকল্প।

মাঝির গান অতুলচন্দ্রকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে আর নীরব থাকিতে পারিল না। প্রকাশ্যে বলিল "মাঝি, রাত্রি কতক্ষণ আছে?" মাঝির কলকণ্ঠ আবার থামিল; সে উত্তর করিল "বড় অধিক নয়, প্রহরেক হইবে।" অতুল বলিল "উঃ! রাত্রি কি দীর্ঘ, এযে আর ফুরায় না।" অতুলচন্দ্র! দেখ সংসারে ইচ্ছার কত প্রভেদ। তুমি রাত্রিকে বিদায় দিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু কত শত হৃদয় আবার সেই রাত্রিকে টানিয়া রাখিতেই সযত্ন। তাহারা রজনার চির-স্থায়ীত্ব প্রার্থী; ইহার অবসানে তাহাদের বিষাদ, তোমার কিঞ্চিৎ শান্তি। যুবক আবার ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মাঝি বলিল "বাবু, রুদ্রতলার অশ্বত্থ গাছ দেখা যাইতেছে, রাত্রিও ফরসা হইয়া আসিল।

অতুল। এই না বলিলে, রাত্রি প্রায় প্রহরেক আছে?

মাঝি। আজ্ঞে আমাদের একটা কথা। আমরা মাঝি মানুষ, আমাদের একটা কথা। শেষ রাত্রির প্রহরে আর আগের রাত্রির প্রহরে অনেক তফাৎ। শেষ রাত্রির প্রহর দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। আর রাত্রি অধিক থাকিলে কি আমি—রাত্রি অধিক থাকিলে কি আমি—রাম! রাম!!

অতুল। চুপ করিলে যে মাঝি? রাত্রি অধিক থাকিলে কি?

মাঝি। আজ্ঞে, রাত্রি অধিক থাকিলে কি আমি এখানে নৌকা লইয়া আসি?

অতুল। কেন এস্থানে কি?

মাঝি। "আজ্ঞে এই অশ্বত্থ গাছটার মাথায় একটা ভূত থাকে। বাবু নৌকা এখানেই রাখি, রাত্রি পোহাইয়া যাউক।" মাঝি একবারে ছাপ্পরের মধ্যে আসিয়া অতুল চন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অতুলচন্দ্র বুঝিল

মাঝি ভয় পাইয়াছে। এই অশান্তির সময়েও একটু কৌতূহল পরবশ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল "ভূত কিরে মাঝি, ভূতে কি করে?"

মাঝি। আজ্ঞে যারা বিয়ে না করিয়া মরে, তারাই নাকি ভূত হয়। মরিলে তাদের প্রকাণ্ড শরীর, বড় একটা মাথা, আর দাড়ি গোঁপে এক বিকট আকার হয়। মানুষ দেখিলেই তাদের হিংসা হয়, আর মারে। একদিন এক মাঝি না জানিয়া, এখানে নৌকা রাখিয়াছিল। ভূত বেটা মুখ, হাত ধুইতে আসিয়া দেখে, নৌকাখানা ঘাটে বান্ধা রহিয়াছে। অমনি নৌকাখানাকে তুলিয়া একেবারে আট ক্রোশ দূরে ফেলিয়া দিল। পরদিন কতকগুলি লোক সেখান দিয়া যাইতেছিল; তাহারা দেখে, নৌকাখানি রাস্তায় পড়িয়া আছে; মাঝি বেটা নাক ডাকাইয়া তাহাতে ঘুমাইতেছে। আজ্ঞে আমি এক বাপের এক ছেলে। ঠাকুরমা বলিয়াছেন, আমাদের বংশে সাত পুরুষ যাবৎ কাহারও ছেলে হয় না। সবে মাত্র আমি এক বংশের এক ছেলে। আমি মরিলে আমাদের বংশে বাতি দেওয়ার লক্ষ্য থাকে না।

অতুল। তোমার আর ভাই নাই?

মাঝি। আজ্ঞে না। তাইত বলি আমি মরিলে কি আমার আর রক্ষা আছে। বাবু আপনারা বড়লোক। টাকার জোরে আপনারা ছেলে মরিলে ছেলে পান; বাপ মরিলে বাপ পান। আমাদের আর কি তা হয়? আমরা একবার মরিলেই একেবারে গেলাম।

অতুল। "তুমি বিয়ে করিয়াছ? তোমার ছেলেপিলে কিছু আছে?" মাঝি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আজ্ঞে সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? সে কথা মনে পড়িলে, আমার আত্মায় দেহ থাকে না। এ অবোধ সংসার যেন পাগলের মত বোধ হয়। বাবু, সংসারের মায়া কাটিন্য বুঝা ভার। বিধি যে কার অদৃষ্টে

কি বিলাপনা লিখিয়া দিয়াছেন তার ঠিক নাই।” অতুলচন্দ্র একটু কৌতূহল পরবশ হইয়া বলিল “কেন তোমার স্ত্রীর কাল হইয়াছে নাকি?”

মাঝি। “আজ্ঞে বাবু আজি দুই বৎসর হইল সর্ব্বনাশী কুলে কালি দিয়া, ওলাউঠার ব্যারামে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। সেই সর্ব্বনাশী আমাকে একেবারে অনাথ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার—” মাঝি আর বলিতে পারিল না। বনিতা-শোক তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল।

অতুল। তোমার কোন সন্তান আছে?

মাঝি। একটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছে বলিয়াইত এতদিন ঘরে রহিয়াছি। নতুবা এতদিন বৃন্দাবন যাইয়া ভেক্ ধরিতাম। বাবু, বলিব কি, আপনাদের বড় লোকের ঘরেও এমন ইস্ত্রী হয় না। কত মারিতাম, কত গালি দিতাম, তবু মুখে কথাটী ছিল না। চক্ষে কখন একফোঁটা জল ফেলে নাই। বাবু, কত সেবা, কত, শুশ্রূষাই করিত। হরি হরি। হৃদয় কষ্টে মাঝি আর বলিতে পারিল না। অতুলচন্দ্র বুঝিল মাঝির মনে অসামান্য কষ্ট।

মণি-মুক্তা-খচিত হর্ম্ম্যতলশায়ী প্রণয়ী প্রণয়িনীর হৃদয়ে যেরূপ প্রণয় তরঙ্গ বিরাজ করে; সামান্য কুটীরশায়ী, দিনান্তে বারেক ভোজী প্রণয়ী প্রণয়িনীর হৃদয়ও অবস্থান্তরে সেইরূপ প্রণয়ই ক্রিয়া করে। উভয় প্রণয়ের বিচ্ছেদেই উভয় সম্প্রদায়ের মহা কষ্ট! বিষম হৃদয়াঘাত! মার্জ্জিত প্রণয় মার্জ্জিত হৃদয়কে যেরূপ পাগল করে, ভুলায়, নাচায়; অমার্জ্জিত প্রণয় অমার্জ্জিত হৃদয়কে সেই পরিমাণে, পাগল করে, নাচায়, ভুলায়। প্রিয় পাঠক! তুমি না হয়, তোমার প্রণয়িনীর অপ্সরা বিনিন্দিত সরল ও শান্তিপূর্ণ পবিত্র মুখে পবিত্র সরল হাসি, পবিত্র

প্রেমভাব দেখিয়া, স্বর্গকে ভুলিবে, জগতকেই চির আবাসস্থল করিতে চাহিবে। সতৈল অসিত বরণা, কৃষ্ণকেশী মাঝি ভামিনীর প্রেমহাসি (বিকট দশন বিকাশ) দেখিয়া, মাঝি ভাবিবে, আমিও স্বর্গে যাইব না; আমিও পৃথিবীতেই থাকিব। আশার তারতম্য ও পরিমাণ ভেদে মনুষ্য জীবনে জগতের সুখ দুঃখ সমুদয়ই সমানরূপে ক্রিয়া করে।

অতুলচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ছেলের কত বয়স? তাহার কি নাম রাখিয়াছ?"

মাঝি। আজ্ঞে সবে মাত্র এই দুই বৎসর। নাম দীপচাঁদ।

অতুল। এখন আর ওসব কথা ভাবিও না। এখন দীপচাঁদকে লইয়াই সাংসারিক কার্য্য কর। সকলকেই একদিন না একদিন মরিতে হইবে।

মাঝি। বাবু, আহা! কি দিব্বি নাক, কি দিব্বি কাণই ছিল।

অতুল। তা ভাবিয়া আর কি হইবে?

মাঝি। রংটী যেন মাজা ছিল।

অতুল। ওসব ভাবিয়া কেন মনে কষ্ট পাও?

মাঝি। "বাবু, সে গড়ন, সে রূপ কি আমি এ দেহে ভুলিতে পারিব? সে কথা মনে পড়িলে যেন আমার দেহের মধ্যে আনল জ্বলে। ও হরি—হরি!"

অতুলচন্দ্র ভাবিল নিরুপায়, মাঝির শোক বেগও উথলিয়া উথলিয়া চলিল। সে একটু নীরব থাকিয়া মাঝিকে বলিল "মাঝি, এখন রাত্রি পোহাইয়াছে, নৌকা ঘাটে লইয়া চল।" মাঝির শোক নিবারিত হইল। আবার বাহিতে বাহিতে নৌকা ঘাটে লইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০•০:—

অতুল মনের ঘোর আবেগে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, তাহা তখন স্থির করে নাই—ভাবিবারও সময় পায় নাই। পথে নৌকায় শুইয়া, অতুল ইহাই চিন্তা করিতে ছিল। চিন্তা করিয়া স্থির করিল, এখন কলিকাতা যাইয়া, কোন বিষয় কর্ম্মের যোগাড় দেখিবে। শৈবালকে যে, সর্প বিবরে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়াই বিষয় কর্ম্ম অনুসন্ধান তাহার স্থিরসঙ্কল্প হইল।

রুদ্রতলার ঘাট হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন তিন মাইল। ষ্টেশনে যাইতে একটী পাকা রাস্তা আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলে, অতুল মাঝিকে ভাড়া দিয়া তীরে উঠিল। মাঝি বখ্‌সিসের জন্য বড় বিরক্ত করিল। অতুলের সঙ্গে একসুট ভিন্ন পোষাক নাই—সে মাঝিকে অতিরিক্ত আট আনার পয়সা দিয়া, বখ্‌সিসের দায় হইতে অব্যাহতি পাইল। প্রাতে সাড়ে আটটার সময় গাড়ী ছাড়িবে। অতুল ষ্টেসনে পৌঁছিবার জন্য দ্রুতগতিতে ছুটিল। ষ্টেশেন আসিয়া দেখে, গাড়ীগুলি সার বাঁধিয়া একের পিছনে অন্যে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখভাগে এঞ্জিন খানাতে ধুঁয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে বংশীধ্বনি করিতেছে। অতুল তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া লইল। পরে গাড়ীতে উঠিতে যাইয়া দেখে, গাড়ীর মুখ পত্তন আরোহীতে ভরা। তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছে "এ গাড়ীতে যায়গা নাই।" অতুল সেই গাড়ী হইতে নামিয়া, অপর গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিল। সেখানেও দেখে, পাঁচ ছয় খানা মুখ জানালায় আসিয়া বলিতেছে "এ গাড়ীতে যায়গা নাই।"

অতুল অপর গাড়ীতে যাইয়াও এরূপ আপত্তি শোনাতে, আরোহীদের কথায় তাহার সন্দেহ হইল। গাড়ীতে উঠিয়া দেখে, গাড়ীর জানালার মুখ কয়খানা ব্যতীত সে গাড়ীতে আর লোক নাই। এবার আর কাহারও আপত্তি শুনিল না; একবারে যাইয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত। ঢং ঢং করিয়া একবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরোহীরা মুখ বাড়াইয়া, কেহ আত্মীয় স্বজনের সহিত আলাপ করিতে ছিল, কেহ চুরুট কিনিতে ছিল, কেহ বা "পানি পাড়ে" বাবাজীকে ডাকিয়া, আর যেন এছার জীবনে জল পাইবে না আশঙ্কায়, ঘটিভরা জল পান করিয়া লইতে ছিল। গাড়ীর পাশ দিয়া পানওয়ালা ডাকিয়া যাইতেছে; মেঠাইওয়ালা ডাকিয়া যাইতেছে; কর্ম্মচারীগণ বড় বড় লণ্ঠন হাতে এদিক ওদিক দৌড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এমন সময় আবার ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইল; গাড়ীর দরজা বন্ধ হইল; আরোহীগণের আত্মীয় স্বজন মধ্যে কেহ চলিয়া গেল; যাহারা নিতান্ত নাছোড়বান্দা, তাহারা অন্তঃকাল পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য দাড়াইয়া রহিল। পরে ঢং ঢং করিয়া আবার একটা শব্দ হইল। গাড়ীতে একটা ধাক্কা লাগিয়া, গড় গড় শব্দে গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সে গড় গড় শব্দ হক্ হক্ শব্দে পরিণত হইয়া, গতি দ্রুত হইল। পরে সে শব্দ হকা হক্ হুক্ শব্দে পরিণত হইয়া, গাড়ী নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিল। আরোহীদের মধ্যে নানা প্রকার বাদসাহী, নবাবী গল্প চলিতে লাগিল। দুই একজন রসিক আরোহী বায়ুর বেগ পাইয়া, একবারে গান ছাড়িয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিয়া, আরোহীর আমদানী রপ্তানি করিতে করিতে, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া, গাড়ী শিয়াল দহ ষ্টেশনে উপস্থিত। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিলে টিকিট সংগ্রহ কারক

একটা কিম্ভূত কিমাকার চাবি দ্বারা গাড়ীর দরজা খুলিয়া, আরোহীদের নিকট হইতে টিকিট লইয়া, তাহাদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। কুলিরা বাহুতে নম্বরওয়ালা বাজু পরিয়া, মোট খুজিয়া বেড়াইতেছে। অতুলের সঙ্গে আসবাব কিছুই নাই, সে সহজেই কুলিদের হাত এড়াইতে পারিল। ষ্টেশন ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখে সারি সারি গাড়ী। কোচ বাক্সে বসিয়া, গাড়োয়ানগণ আরোহী ডাকিয়া, আপন আপন গাড়ীতে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। অতুল কোথায় যাইবে স্থির না থাকাতে, গাড়োয়ানদের হাতও সহজে এড়াইতে পারিল।

অতুল কখনো কলিকাতা আসে নাই। সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখে প্রকাণ্ড স্থান; রাস্তা ঘাট লোকে গাড়ীতে পরিপূর্ণ—জীবন্ত কার্য্য-ক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। চারিদিক এমারতে সুসজ্জিত, ফিরি-ওয়ালাগণ নানাবিধ আওয়াজ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কলিকাতার দৃশ্য দেখিয়া, কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, যুবকের চিন্তা হইল, কোথায় যাইবে, কি করিবে। লক্ষ্যহীন নবাগত লোকের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবেও কলিকাতা বড় গোলমেলে যায়গা।

অতুলের মাতুল বংশীয় একজন পরিচিত লোক কলিকাতায় বাস করিতেন; অতুল তাহা জানিত। কিন্তু তিনি এত বড় সহরের কোথায় থাকেন, তাহারা কোন অনুসন্ধান জানিত না। অতুল শুনিয়াছে সহরে অনেক হোটেল আছে; আগন্তুকগণ তথায় থাকিতে পারে। সে রাস্তায় একজন লোককে একটী হোটেলের অনুসন্ধান করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। লোকটী অতুলকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতার একটী হোটেল দেখাইয়া দিল। সামান্ত জলযোগ ভিন্ন সমস্ত দিন অতুল অন্নাহার করে নাই। হোটেলে যাইয়া স্নান আহার করিয়া, সে সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিল।

পর দিন প্রাতে অতুল আত্মীয়টার অনুসন্ধানে বাহির হইল। কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, কত অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে তাঁহাকে পাওয়া গেল। অতুল তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখে, তিনি আফিসের কার্য্য করিতেছেন। সে তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল মার নাম করিয়া পরিচয় দিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমাকে অতি ছেলে বেলা দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই চিনিতে পারি নাই।" তিনি ঝিকে ডাকাইয়া, অতুলের থাকার কথা বাড়ীর ভিতর বলিয়া পাঠাইলেন। অতুল তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিয়া কতক দিন কাটাইলেন।

আসিবার সময় শৈবালকে জানাইয়া আসে নাই; আজি শৈবালের জন্য অতুলের প্রথম চিন্তা। পাঠক, অতুল শৈবালকে হৃদয়ের উন্মত্ততা দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু সরল প্রতিমা শৈবাল চরিত্র বলে তাহার হৃদয় হইতে স্নেহ, মমতা, ভক্তি প্রভৃতি সৎভাব গুলি একে একে কাড়িয়া লইয়াছিল। তুমি আর কি চাও? হৃদয়ের সু গুলি পাইলে, কু গুলির জন্য তুমি লালায়িত হইবে কেন? শৈবালকে অতুল কোন দিন যত্ন করিয়া "ক" অক্ষরটী শেখায় নাই; অথচ অতুলের সন্তোষার্থে শৈবাল নিজে চেষ্টা করিয়া সামান্য রকমের লেখা পড়া শিখিয়াছিল। অতুল ভাবিয়া চিন্তিয়া শৈবালকে চিঠী লিখিবে স্থির করিল। অবশেষে লিখিল—

শৈবাল,

কোন কারণে আমি হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি; তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই। তোমাকে যে ভাবে রাখিয়া আসিয়াছি; তাহাতে আমি সর্ব্বদা ভাবিত থাকি। কি করিব? এরূপ অবস্থায়ই তোমাকে অন্য সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে। তোমাকে

একদিন বলিয়াছিলাম, বোবার শত্রু নাই। সেই উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিও। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা মানুষের মহৎ গুণ; স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা বিশেষ দরকার; ইহাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। আমাকে এখন বাধ্য হইয়াই, বিষয় কর্ম্মের যোগাড় দেখিতে হইতেছে। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া থাক. তিনিই আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন ও আশ্রয় দিবেন। তোমার মঙ্গল প্রার্থনীয়।

তোমার

অতুল।

অতুল চিঠী লিখিয়া ডাকে দিল; যথাসময়ে চিঠী আসিয়া মতিগঞ্জের ডাক ঘরে পৌঁছিল। পাঠক, জানেন পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, মতিগঞ্জের ডাক ঘর একটী বড় আড্ডা। গ্রামের অপদার্থ যুবকগণ ডাক ঘরে থাকিয়া, বউদের নামে চিঠী আসিলে তাহা খুলিয়া পড়িত; ইচ্ছা হইলে কাহাকে চিঠী দিত, কাহাকে দিত না, পরে চিঠীর কথা পাড়িয়া, গ্রামে নানা কথা রটনা করিয়া, আমোদ উপভোগ করিত। আজি শৈবালের নামে অতুলের চিঠী আসিলে, কয়েকটী বালক তাহা খুলিয়া পড়িতে চাহিল। ভোলানাথ বাবু ডাক ঘরে ছিলেন, তিনি চিঠী খানা চাহিয়া লইলেন। বালকেরা পড়িতে পারিল না। বরং তিনি যাওয়ার কালীন ডাক বাবুকে বলিয়া গেলেন "শৈবালের নামে কোন চিঠী আসিলে, তাহা অন্য কাহারো হাতে না দেন। শৈবালের নামীয় চিঠী লওয়ার জন্য, অতুল যাওয়ার কালে তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছে। ডাক বাবুও আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; কারণ ডাক বিভাগ বড় কড়া।

অতুলের চিঠী শৈবাল পাইল না। এ দিকে অতুলের বাড়ী ত্যাগের কারণ না জানিয়া, শৈবাল যেমন দিবারাত্রি অতুলের বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল; শৈবালের নিকট হইতে যথাসময়ে উত্তর না

আসাতে অতুলও তদ্রূপ শৈবালের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল। সে শৈবালকে ক্রমে ক্রমে আরো দুই খানি চিঠী লিখিল। তাহারও কোন উত্তর পাইল না। মনে ভাবিল "শৈবাল হয়ত চিঠী লিখিবার উপযুক্ত লেখা পড়া শিখে নাই।" ইহা ভাবিয়া আর চিঠী লিখিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী। আকাশের কোলে মেঘ ভরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়িতেছে না। মেঘের আড়ালে থাকিয়া, দুই একটী নক্ষত্র অতি উচ্চাদপি উচ্চ স্থানে নিবি নিবি জ্বলিতেছে। কোলাহল শূন্য অর্দ্ধ-রজনীতে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ; তৎসঙ্গে পেচকের নিনাদ। ইহা ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। প্রায় সকল প্রাণীই নিদ্রিত। কেবল একটী প্রৌঢ় মতিগঞ্জের একখানি ভদ্রাবাসের নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মুখে বাক্যস্ফুটন নাই। চকিত নয়নে যেন কিছুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। কেহ বলিয়া না দিলেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এই ব্যক্তি কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। এই ভীষণ অন্ধকার মধ্যে শিশির সম্পাতকে তুচ্ছ করিয়া প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া।

এ সংসারে পাপীর হৃদয়ে সুখের স্থায়ীত্ব কতক্ষণ? পাপী পাপ কার্য্য সাধিতে পাপক্ষেত্রে যাইতেছে, তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে, হৃদয়ের আমূল প্রদেশে ভীতি পীড়ন। হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছে। সমাজ তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহাকুল চিত্তে

পাপী সভয়ে পাপক্ষেত্রে চলিয়াছে। তবে, পাপীর সুখ কোথায়? পাপক্ষেত্রের পূর্ব্ব প্রদেশে হৃদয়ে ভীতি চিহ্ন। পাপক্ষেত্রের মধ্য প্রদেশে তাহার জন্য ক্ষণিক সুখ বটে, কিন্তু পরক্ষণে তাহার জন্য কি রহিয়াছে? অনুতাপ! আত্মগ্লানি! দুঃখ! তবে হে পাপী! তোমার হৃদয়ে সুখ কি? পুণ্যাত্মা! তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে যে পবিত্র সুখের ছায়া অঙ্কিত, কোন পাপীর হৃদয় ক্ষণকালের জন্য সে সুখ ভোগ করিয়াছে? প্রিয় পাঠক! চাহিয়া দেখ আজি পাপী হৃদয়ে কি সন্দেহ, কি ভীতি লইয়া, আপন কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়াছে। শৈত্যতা-নিবন্ধন দেহ কাঁপিতেছিল, রোমাঞ্চে শরীরের কর্কশতা সম্পাদিত হইতেছিল; তথাপি প্রৌঢ় অবিচলিত হৃদয়ে আপন লক্ষ্য অবলম্বনে দাঁড়াইয়া।

পাঠক! দেখিও না, মনে ঘৃণা হইবে। লোক চরিত্র পর্য্যালোচনা করিও না, সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিবে। যদি অন্তরের সুখ চাও, কিছু দেখিয়াও দেখিও না, ভুলিয়া যাইও। শুনিয়াও শুনিও না, ভুলিয়া যাইও।

প্রৌঢ়কে আর অধিকক্ষণ একাকী থাকিতে হইল না। অতি নিঃশব্দে একটী যুবতী আসিয়া, চুপি চুপি প্রৌঢ়ের সহিত মিলিত হইল। পরস্পর সাক্ষাতে উভয়ের মুখই হাসিতে পূর্ণ হইল; কিন্তু সে হাসি পবিত্রতার হাসি নহে। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া উন্মত্ত।

সদ্ভাব কি অসদ্ভাব এই কষ্টকর ভীষণ রজনীতে পরস্পরকে সম্মিলিত করিয়াছে, আপনাদিগকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সংসারে পুণ্যের কার্য্য কখনও গোপনে সম্পন্ন হয় না। পুণ্যাত্মার হৃদয়ে অসীম বল; কষ্ট হউক, দুঃখ হউক, বিপদ হউক, বিঘ্ন হউক, পুণ্যাত্মা সমস্ত জগৎকে দেখাইয়া, তাহার কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু পাপীর হৃদয় কলুষময়, দিবালোক সহ্য করিবে কেমন করিয়া?

পাপীর হৃদয় অন্ধকারে পরিপূর্ণ। অন্ধকারে থাকিয়া, তাহার হৃদয় যেমন চুপি চুপি পাপ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহার দেহও অন্ধকারেই হউক, অথবা অপ্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক, জগতকে বঞ্চনা করিয়া, আপনার পাপ কার্য্য সম্পাদন করে।

প্রৌঢ় নবাগতা রমণীর হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এত বিলম্ব কেন?" রমণী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল "চুপ্, আস্তে আস্তে কথা কহিও। এতক্ষণ ও জাগিয়া ছিল, তাহাতেই আসিতে পারি নাই।" নরকের কীট !!

প্রৌঢ়। এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ?

রমণী। এক বাধা দূর হইল, কিন্তু এখনও আমাদের পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত হয় নাই।

প্রৌঢ়। সে ছোঁড়াটা এখন কলিকাতায়।

রমণী। সে যে ভাবে বাড়ী ছাড়িয়াছে, তাহাতে তাহার শীঘ্র ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রতি বৃদ্ধের এমন বিরক্তি জন্মাইয়া দিয়াছি যে, বৃদ্ধ তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রৌঢ়। আর ছুঁড়ীটা।

রমণী। এ কণ্টক সহজে দূর হইবার নয়। ছোঁড়াটাকে এক প্রকারে সরান গেল, কিন্তু ইহাকে দূর করি কিরূপে?

প্রৌঢ়। অতুলচন্দ্রকে কি করিয়া তাড়াইলে?

রমণী। আমার প্রতি তাহার অসদ্ভাবেচ্ছা, বৃদ্ধকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে, বৃদ্ধ শুনিবামাত্র রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগে অতুলচন্দ্রকে ডাকাইয়া, তাহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। ক্রোধভরে তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন।

প্রৌঢ়। তোমার বুদ্ধিকে ধন্য! তোমার ভালবাসার সীমা নাই। আমাদের সুখপথ নিষ্কণ্টক করিবার, জন্য তুমি এতদূর কষ্ট স্বীকার করিলে। কিন্তু প্রাণের কাদম্বিনী, আমি আমার ভালবাসার কার্য্য কি দেখাইলাম? - ছেলেটার চিঠীর ধরণে বুঝা যায় সুবিধা করিতে পারিলে, বউটাকেও এখান হইতে লইয়া যাইবে।

রমণী। "প্রিয়তম, তুমি কি জাননা? তোমার জন্য, এ কোন ছার! প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও প্রস্তুত।" একটু নীরব থাকিয়া বলিল "বউটাকে যদি লইয়া যাইত, তবে সকল আপদ চুকিয়া যাইত। কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এখনও অনেক কার্য্য বাকী আছে। বউটাকে গৃহ হইতে দূর করা ও অতুলচন্দ্রের চির নির্ব্বাসন বা তাহার একেবারে নিঃশেষ ভিন্ন, আমরা নিষ্কণ্টকে এ সুখ ভোগ করিতে পারিব না।"

উভয়েই আবার কিছুকালের জন্য নীরব হইল। তমসাচ্ছন্ন নিশি বক্ষে উভয়েই কিছুকালের জন্য চিন্তামগ্ন হইল। প্রৌঢ় মনে মনে কি যেন স্থির করিয়া, পুনরায় বলিল "প্রথম কার্য্যের ভার আমি লই-লাম। দ্বিতীয়টী কিরূপে সম্পাদিত হইবে?"

রমণী। সেটী বড় সহজ নয়। পোড়ার মুখীর ওদিকে আবার কেহ নাই। থাকিলে এখনই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া, এ কণ্টক দূর করিতাম।"

যুবতী আবার নীরব হইয়া মনে যেন কি স্থির করিল। পরক্ষণেই প্রৌঢ়ের গলদেশে বাহু সংলগ্ন করিয়া বলিল "গৃহের কণ্টক দূর করিতে, যতই দুঃসাহসিক কার্য্যের আবশ্যকতা হয় না কেন, তাহা আমি করিব, ছেলেটার সম্বন্ধে যাহা করিতে হয় তোমাকে করিতে হইবে।"

যুবতীর স্থির প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে দ্বিতীয় পাপাত্মার মনও একটু

চমকিত হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, যুবতীর চিবুক ধারণ করিয়া বলিল "প্রিয়তমে! তোমাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শীঘ্রই অতুলচন্দ্রের নিঃশেষ সম্পাদনে যত্নপর হইব। এই সুখপথ নিষ্কণ্টক করিব।"

রমণীর মুখে হাসি দেখা দিল। পাঠক, চল, এই পাপদৃশ্য দেখিয়া আর আমাদের কি হইবে? চল এ শিশির সম্পাতে আর আমাদের দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই।

অই দেখ প্রৌঢ়কে দেখিয়া, একটী কুকুর কেমন ঘেউ ঘেউ করিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। দৌড়াইয়া আসিয়া যুবতীকে দেখিয়া, লেজ নাড়িয়া, এক একবার তাহার পদতলে পড়িতেছে, আবার প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে। প্রৌঢ়ের বাহু যুবতীর গলদেশে সংলগ্ন ছিল, দেখিয়া কুকুর তাহাকে কামড়াইতে উদ্যত হইল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে বাড়ীর লোক জাগিবার উপক্রম। যুবতী কত চেষ্টা করিয়া কুকুরকে থামাইতে পারিল না। প্রৌঢ়কে বাধ্য হইয়াই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

পরদিন ভুবন মোহন রায় জানিলেন কাদম্বিনীর পোষা কুকুরটী রাত্রিতে তাহাকে কামড়াইয়াছে। রায় মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, বিষ নামাইবার জন্য কত ওঝা আনাইলেন। কত ঔষধ আনাইয়া কাদম্বিনীকে খাইতে বলিলেন। কাদম্বিনী ঔষধ লইল, কিন্তু খাইল না। কুকুরটী মারিবার জন্য গ্রামের একদল শিপাহী-ছেলে নিমন্ত্রিত হইল। তাহারা বন্দুকধারী ফৌজ নয়; বড়শার প্রহারে কুকুরকে সংহার করিবে। বালকেরা প্রথমতঃ কুকুরটীকে বাঁধিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুকুর ভয় পাইয়া, পালাইয়া যাইয়া, কাদম্বিনীর পাশে আশ্রয় লইল। কাদম্বিনী কুকুরকে সে স্থান হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। পরে

বীর বালকেরা তাহাকে ধরিয়া, একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিল। বাঁধিয়া বড়শীর আঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিয়া, ভুবন মোহন রায়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করিল। কাদম্বিনী বালকদিগকে নানা দ্রব্যে জলযোগ করাইল। আজি পিতামহী ঠাকুরাণী কাদম্বিনীর কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "এত দিনের পোষা কুকুর, তাকে কি এমন করিয়া মারিতে আছে?" কুকুর মারাতে বৃদ্ধার প্রাণে বড় লাগিয়াছে। কাদম্বিনী এখন আর এ সমস্ত মায়া দয়ার ধার ধারে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অতুলের হৃদয়ে আজি জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত। সে বুঝিল বিষয় কর্ম্মের যোগাড় না হইলে আর উপায় নাই। যে শৈবাল এতদিন তাহার উপেক্ষার পাত্রী ছিল, সে শৈবালের চিন্তাই আজি তাহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা। সে চিন্তাই তাহার বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করার কারণ। যে বালক পঠদ্দশায় কল্পনার ক্ষেত্রে আশার কুহকিনী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্য-ক্ষেত্র কত ফুল ফলে সুশোভিত দেখিয়া ছিল; যে বালক সংসারকে সুখের আবাস ভূমি বলিয়া মনে করিয়া ছিল; আজি সে অতুল দেখিল, সংসারের কার্য্য ক্ষেত্র বড় জটিল, সংসার কেবল কর্ত্তব্যের বন্ধনাগার। আজি অতুল বুঝিল ইংরাজ কবির—

I slept and dreamt that life was beauty,
I woke and found that life was duty.

কবিতা সত্য সত্যই সত্য। যে জীবনকে পূর্ব্বে কেবল সৌন্দর্য্য

ভাবিয়া ছিল, আজি বুঝিল তাহা সৌন্দর্য্য নয়—তাহা খালি "কর্ত্তব্য"। আজি অতুলের হৃদয়ে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত।

সভ্যদেশ মাত্রেই শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য আছে। শিক্ষান্তে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। বালক বালিকার মানসিক ধারণা ও বল বুঝিতে পিতা মাতা যদ্রূপ সক্ষম, তদ্রূপ আর কেহই নয়। সভ্য দেশে সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্তির পর, পিতামাতা বালক বালিকার মানসিক ধারণা ও বল বুঝিয়া, তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করেন ও তাহাদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। এদেশে তাহার অভাব। এদেশে বালক বালিকার মানসিক ধারণা নির্দ্ধারণে, অভিভাবকের ভ্রুক্ষেপ নাই; তাঁহারা শিক্ষার্থীর কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচনেও অক্ষম। দেশ শুদ্ধ শিক্ষার্থীর শিক্ষার গতি এক ভাবময় হওয়াতে, সকলেরই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রায় এক হইয়া দাঁড়ায়; কাযেই কর্ম্মক্ষেত্র বিষম প্রতিযোগীতার রঙ্গস্থল হইয়া পড়ে। তথায় অনেককেই অকৃতকার্য্য হইতে হয় বলিয়া, কর্ম্মার্থীর মধ্যে একটা সার্ব্বজনিক অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। আর এক কথা, পূর্ব্বে এদেশে শিক্ষার্থীর জীবন ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত হইত। বিলাস কি, শিক্ষার সময় তাহারা তাহা বুঝিতে পারিত না। ব্রহ্মচর্য্য এ দেশ হইতে লোপ হওয়াতে শিক্ষার্থীর নৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। উচ্চশিক্ষার স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু বালকগণের নৈতিক চরিত্র যে, দিন দিনই হীনবল হইয়া পড়িতেছে। এখন কার শিক্ষার্থীগণের শারীরিক ব্রহ্মচর্য্যের অভাব অপেক্ষা মানসিক ব্রহ্মচর্য্যের অভাব আরও অধিক। হাতে যেই বহি পড়িল, তাঁহাদের মনোরাজ্যও কল্পনার মোহময় চিত্রে চিত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের শিক্ষা লক্ষ্য-শূন্য, বাল্যেই হৃদয় কল্পনা লক্ষ্যে ধাবমান; সহজ তৃপ্তি তাহাদের নিকট হইতে বাল্যেই বিদায় গ্রহণ করিল। কর্ম্মক্ষেত্রের

দ্বারে উপস্থিত হইয়াই তাহারা দারুণ মর্ম্মাহত হয়। নিরাশা তাহাদের প্রাণ মথিত করিতে থাকে।

অতুলের ভাগ্যে আজি তাহাই সংঘটন। যে হৃদয় অতি তরুণ অবস্থায় সংসার ছাড়িয়া আকাশে, আকাশ ছাড়িয়া এক দিশাহারা শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আজি সে হৃদয় সে কল্পনার উচ্চ রাজ্য হইতে পার্থিব জগতে ফিরাইয়া আনিতে, তাহার প্রাণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল না বলিয়া, যে যুবক বালকের ন্যায় নৈরাশ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল; সংসারে একা থাকিলে আপনার জীবনকে সে এক দিকে ভাসাইয়া দিতে পারিত! কিন্তু কর্ত্তব্য আসিয়া, দয়া আসিয়া, তাহাকে সংসারের দিকে জোরে বলে টানিতেছে—অতুলের সংসার ছাড়িয়া এক পা কোথাও যাইবার যো নাই। শৈবাল! অতুল আজি কেবল তোমার জন্যই বড় খাট হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতেছে। পথ পাইতেছে না; অন্ধকারময় প্রাণের ভিতর আছাড় খাইয়া, এক একবার পা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছে।

যে আশার দাস হইয়া, ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্র কত কল্পনার চিত্রে চিত্রিত করিয়াছিল; সে কেমনে আবার ধুলাবালি লইয়া আসিয়া খেলা পাতিবে? শিক্ষারম্ভে যাহার কোন লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল না, সে আজি সংসারের কোন্ কার্য্যক্ষেত্রের পথিক হইবে? অনেক তর্ক মীমাংসার পর অতুল ভাবিল, স্বাধীন ভাবে কিছু করিয়া, জীবিকার কোন উপায় করিতে পারে কি না। যুবক তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল; পরে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিল, মূলধন ভিন্ন ভদ্র সন্তানের পক্ষে স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের সুবিধা নাই। যাহা আছে, তাহা ইতর লোকের জন্য। যে নিতান্ত জাত্যভিমানী, ইহা তাহার জন্য নয়। তথাপি

এই চেষ্টা অতুল একবারে ছাড়িয়া দিল না। অনুসন্ধান করিয়া আর একটী উপায় উদ্ভাবন করিল। কিন্তু তাহাতে লাভ দাঁড়ান সময় সাপেক্ষ। শৈবালের অবস্থা ভাবিয়া এ বিলম্বও তাহার সহ্য হইল না। স্বাধীন জীবিকার আশা অতুলকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইল। শৈবাল! চাহিয়া দেখ, যে অতুল তোমাকে ভাবিয়া, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিয়াছে; কেবল তোমারই জন্য সে অতুল আজি স্বাধীন জীবিকার আশাও বিসর্জ্জন করিল।

বাঙ্গালীর গৌরবের ধন দাসত্ব। বাঙ্গালীর জন্য ইহাপেক্ষা উচ্চপদ সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালীর সর্ব্ব আশা-প্রবাহিনীর লক্ষ্য দাসত্ব সাগরে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য অতুল আজি প্রস্তুত। সে আজি চাকুরীর জন্য লালায়িত। সে আজি উমেদার; অতুলের জীবন আজি ধন্য হইতে চলিল।

অতুল যাঁহার বাড়ীতে থাকিত, তিনি সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী। দীর্ঘকাল তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া, তাহার অন্ন ধ্বংশ করিতেছে ভাবিয়া, অতুল বড় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। তিনি নিজে প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলিতেন না। কিন্তু তাঁহার মার মধ্যে সময় সময় বিরক্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত। কোন দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইত; বাড়ী আসিয়া দেখিত ভাত কটী রান্না ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। অপরাধীর মত তাহাই খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত। এ অবজ্ঞা ভাব অতুলের প্রাণে বড় লাগিল। সে কখন বীতস্পৃহ-জীবন বৃদ্ধের ন্যায় আপনা আপনি বলিয়া ফেলিত "জগদীশ! কখন পরিত্রাণ করিবে?" বঙ্গ সংসারে উমেদারী জীবনে যাহারা অন্নের জন্য পরের মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রায় সকলেরই অদৃষ্টে এ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আমরা এরূপ আশ্রয়দাতাদিগকে বলি, যদি তাঁহারা দয়া করিয়া কাহাকেও এরূপ

ভাবে আশ্রয় দেন,তাহার প্রতি যাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শিত না হয়, তাহাতে যেন একটু দৃষ্টি রাখেন। এরূপ লোক আপন প্রাণে আপনিই মরিয়া। অবজ্ঞায় তাহাদের হৃদয়ের বল আরো কমিয়া যায়; মরা প্রাণ আরো মরিয়া যায়। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়া, অবজ্ঞা করিলে তাহাতে পুণ্য না হইয়া বরং পাপ হয়।

এরূপ অবস্থা সত্বেও অতুল তাহার আত্মীয়টীর নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, দীর্ঘকাল অবস্থান জনিত তাহার লজ্জা জানাইত। চাকুরীর জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস পাইত না। সামান্য কর্ম্মচারী বলিয়া, তাঁহারও ততদূর প্রতিপত্তি ছিল না। চাকুরীর বাজার দিন দিনই মন্দা হইয়া পড়িতেছে। সহায় নাই, মুরুব্বী নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি নাই, কত চেষ্টা ফিকির করিয়াও অতুল কৃতকার্য্য হইতেছে না। যুবকের মুখে যে, স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতা ছিল, প্রতিভা ছিল, তাহাতে দিন দিন কালিমা পড়িতে লাগিল।

অতুল বুঝিল কলিকাতার হাবভাব ভিন্ন প্রকৃতির। গ্রামে যেমন ছোট বড় সকল লোকের মধ্যে একটা সার্ব্বজনিক আত্মীয়তা আছে, সহরে তাহা নাই। এখানে পাশাপাশি বাড়ীর লোকের সহিত পাশাপাশি বাড়ীর লোকের পরিচয় নাই। অতুল কলিকাতার কাহারো নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইল না; বরং অনেকে মুখে আশ্বাস দিয়া, কার্য্যে প্রতারণা করিল। তাহার নিজের জেলার একজন উচ্চ পদবীস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন; অতুল তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া লইল। অতুলের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া তিনি তাহাকে ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন। অতুল দেখিত তিনি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনটাতেই কৃতকার্য্য হন না। ইহাতে অতুল নিজের অদৃষ্টের প্রতিই দোষারোপ করিয়া, নিজকে প্রবোধ দিয়া স্থির

থাকিত। আরো দুই একজন উচ্চ পদস্থ লোক অতুলকে চাকুরীর জন্য অন্যের নিকট চিঠী পত্র দিলেন, নিজেরাও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অতুল ক্রমে ক্রমে বুঝিল, চেষ্টা ফিকিরের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে, অনুরোধ চিঠীর মধ্যেও সঙ্কেত ধ্বনি আছে। রক্ত মাংসের আত্মীয় না হইলে, শুদ্ধ মুখের খাতিরে কেহ কাহার জন্য চেষ্টা ফিকির করে না। অন্যের চেষ্টায় তাহার কিছু হইবে না বলিয়া এখন তাহার স্থির বিশ্বাস হইল। এক এক দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, অতুল হতাশ হৃদয়ে, একব্যরে শুইয়া পড়িত। বাসায় অপর একটী বালক তাহাকে লইয়া এই জন্য কৌতুক করিত; কিন্তু অতুলকে এইরূপভাবে কিসে শোয়ায় তাহা সে বুঝিতে পারিত না। প্রাণের হাত পা ভাঙ্গিয়া আসিলেই মানুষকে শোয়াইয়া ফেলে; তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। এক দিন আর সহ্য করিতে পারিল না; যুবক একেবারে নীরবে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "শৈবাল তুমি মর, আমিও মরি, সংসারের আপদ চুকিয়া যাক্।"

এরূপে জীবন সংগ্রাম করিতে করিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। এক দিন অতুল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিল, শ্যামপুরের জমীদার কান্তি বাবু একজন কর্ম্মচারীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বেতন ২৫৲ টাকা; কার্য্যে পারদর্শীতা দেখাইতে পারিলে, অতি সত্বরই উন্নতির আশা আছে। কান্তি বাবুর স্বজাতি হইলে, তাহার আবেদনই অধিক আদরণীয় হইবে; খাওয়া দাওয়ার ভিন্ন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। অতুল দেখিল, তাহার যে গুণগ্রাম আছে, তাহাতে সে এই কার্য্যের জন্য আবেদন করার উপযুক্ত। অতুল এই পদের জন্য আবেদন করিল। সৌভাগ্য ক্রমে কয়েক দিন পরই আবেদন গ্রাহ্য হইয়া উত্তর আসিল। অতুল কর্ম্মস্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহার বাড়ীতে ছিল,

তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মা আরো অধিক সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিনি অতুলকে এক সন্ধ্যা ভাল করিয়া খাওয়াইলেন। যাওয়ার দিন অতুলকে মাথার দিব্বি দিয়া বলিয়া দিলেন "আমাকে সেখানে যাইয়াই চিঠী লিখিও, নতুবা আমি বড় ব্যস্ত থাকিব।" বৃদ্ধার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া, এই কষ্টের সময়ও অতুলের হাসি পাইল। সংসারেই এই ভাব। পরে অতুল সকলকে অভিবাদন করিয়া শ্যামপুর রওনা হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কান্তি বাবু শ্যামপুরের জমীদার। আয় বিশ পঁচিশ হাজার টাকার কিঞ্চিৎ অধিক। বাড়ীটী বেশ জাঁকাল; দেখিলে লক্ষ্মীর আবাস ভূমি বলিয়া বোধ হয়।

কান্তি বাবুর পুত্র সন্তান নাই। সবে মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কুমুদিনী আপনার অপরিসীম সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া, পিতার স্নেহ সরোবরে ফুটিয়া রহিয়াছে। কান্তি বাবু এই স্নেহ-কুসুমকেই লক্ষ্য করিয়া, সংসার সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছিলেন।

বিভব ঐশ্বর্য্য করতলস্থ হইলে, যে সমস্ত গুণ আসিয়া মনুষ্যকে আশ্রয় করে, সৌভাগ্য ক্রমে কান্তি বাবুর স্কন্ধে তাহারা চাপিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতি কার্য্যেই ধর্ম্ম পরিচালক। তিনি প্রতি কার্য্যেই সুন্দর-সুনির্ম্মল দেবভাব প্রকাশ করিতেন। নির্ম্মল যশ সৎকার্য্যের অনুচর। ক্রমে দেশ দেশান্তরে কান্তি বাবুর যশ পরিচালিত হইল; তাঁহার সৎকার্য্যের সীমাও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

লস্করপুর শ্যামপুরের সপ্তগ্রাম। সুরেশ বাবু তথাকার জমীদার। কান্তি বাবু ও সুরেশ বাবু উভয়েই এক বংশোদ্ভব। উভয়েরই পূর্ব্ব পুরুষ নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া, পারিতোষিক স্বরূপ উক্ত গ্রামদ্বয় লাভ করেন। সদাশিব মুন্সী মৃত্যু কালে আপনার দুই পুত্রকে দুই গ্রামের জমীদারী ভাগ করিয়া দিয়া যান। সেই হইতে দুইটী জমীদার বংশ আপন আপন গ্রামে বিভিন্ন রূপে বাস করিতেছিলেন।

লস্করপুরের বর্ত্তমান জমীদার সুরেশ বাবু কান্তি বাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। উভয়েরই নাম দেশে বিদেশে রাষ্ট্র ছিল। উভয়েই সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত। কান্তি বাবু সৎকার্য্য দ্বারা লোকের শ্রদ্ধার ভাজন। সুরেশ বাবু অসচ্চরিত্রতা নিবন্ধন লোকের ঘৃণার ভাজন হইয়াছিলেন; প্রভেদ এই মাত্র।

জগত সংসারে কাহারো আত্মা সম্পূর্ণ কলুষিত বা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে না। সুরেশ বাবু যশেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, নিজব্যয়ে আপন গ্রামে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উপযুক্ত পাত্রেই হউক, অথবা অনুপযুক্ত পাত্রেই হউক, মাঝে মাঝে দান ধ্যানটাও করিয়া থাকিতেন। কান্তি বাবুর নির্ম্মল যশ ঘোষণা সুরেশ বাবুর সহ্য হইল না। তাঁহার মনে দারুণ হিংসা আসিয়া আবির্ভূত হইল। তিনি কান্তি বাবুর সুনাম-লোপ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করার প্রয়াশ পাইলেন। কারসাজী করিয়া কান্তি বাবুর বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিলেন। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। প্রতি চেষ্টায়ই সুরেশ বাবু বিফল মনোরথ হইলেন। উভয় পক্ষেই শত্রুতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইতে পারে না।

অবস্থাভেদে তাহা পরিস্ফুটনে বাধা জন্মাইতে পারে ; কিন্তু তাহা কিছুতেই লোপ পাইতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্র পাইলেই উহার পুনরায় উন্মেষ হয়। অতুল স্বভাব হইতে সুন্দর মানসিক ক্ষমতা পাইয়াছিল। অবস্থায় পড়িয়া সে ক্ষমতা শিক্ষায় ব্যয়িত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষমতা এখনো তাহার মনে দিব্য প্রতিভাত রহিয়াছে। অতুল কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধারণা বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদয় শিখিয়া ফেলিল। কান্তি বাবুর সরকারে অতুল এখন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কর্ম্মচারী। প্রথম সাক্ষাতেই অতুলের প্রতি তাঁহার কোমল হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার গুণ গ্রাম ও চরিত্র দেখিয়া, তিনি আরো মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এখন অতুলকে তিনি আপন সন্তানের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি বয়সে পিতৃতুল্য, তবু প্রত্যেক কার্য্যে অতুলের পরামর্শ লন। অতুলকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তিনি কোন কার্য্য করেন না। অতুল ক্রমে কান্তি বাবুর সংসারের লোক হইয়া দাঁড়াইল। পরিবারের কোথাও যাইতে তাহার বাধা নাই। কান্তি বাবুর স্ত্রীও অতুলকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কান্তি বাবুর সংসার বড় সুন্দর। সেখানে কলহ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাহা প্রীতি, স্নেহ ও পবিত্রতায় পূর্ণ। অতুল বুঝিয়াছিল, সংসার মায়ামমতাশূন্য একটা বালুকাময় মরুভূমি ; ইহা মানুষকে দগ্ধ করিবার জন্য মরীচিকা সাজাইয়া রাখিয়াছে। আজি আবার অতুল বুঝিল, এ মরু হৃদয়েও পুষ্পোদ্যান আছে ; এ মরু হৃদয়েও শান্তি-সলিল-পূর্ণ সরসী আছে। কান্তি বাবু ও তাহার স্ত্রীর স্নেহ মমতা দেখিয়া, অতুলের হৃদয় একবারে গলিয়া গেল।

সংসারে পথভ্রষ্ট লোককে পথে ফিরাইতে শাসন দণ্ডের প্রচার কেন ? ভালবাসা থাকিতে আবার কঠোর শাসন দণ্ড কেন ? ঘোর

যে নারকী, তাহাকে ভালবাস, সে পথে ফিরিয়া সংশোধিত হইবে। এক দিনে না বুঝুক, দশ দিন পরেও তোমার প্রকৃত ভালবাসা বুঝিতে পারিলে, সে পথে ফিরিবেই ফিরিবে; সে আর পূর্ব্ববৎ থাকিতে পারিবে না। ভালবাসার ন্যায় শাসন দণ্ড জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই ভালবাসায় নিতাই ঘোর পাপী জগাই মাধাইকে বিশ্ব-প্রেমে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই ভালবাসাতেই যীশুখ্রীষ্ট উপাসক মণ্ডলীর নিকট ঈশ্বরপুত্র বলিয়া পূজিত। ভালবাসার মূল পবিত্রতা। পবিত্রতাশূন্য ভালবাসা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। তাহার নাম কামনা; স্বার্থ তাহার পরিচালক। সংসারে মাতৃস্নেহ ভালবাসার আদর্শ। তাহাতেই মার কোলে বসিয়া, পাপীও সেই সময়ের জন্য পবিত্র হয়। পাপীকে যদি মা'র মত ভালবাসিতে পার, এক দিন না হয়, দশ দিনে পাপী সারিয়া যাইবে। অতুল সংসার পীড়নে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল; পথভ্রান্ত হইয়াছিল; কান্তি বাবুর সংসারের ভালবাসা পাইয়া একবারে গলিয়া গেল। তাহার হৃদয়-খানি পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া, কোমল হইতে কোমলতর হইল। কান্তি বাবুর ও তাহার স্ত্রীর এক একটী সম্বোধনে, এক একটী স্নেহ ব্যবহারে তাহার মনে লইত, বুকের ভিতর হাত দিয়া, হৃদয়টাকে বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে দেখায়; দেখাইয়া তাঁহাদের চরণে প্রাণের যথা সর্ব্বস্ব সহ উৎসর্গ করে।

মেঘাচ্ছন্ন রজনীর তমসাকাশে মাঝে মাঝে দুই একটী নক্ষত্র পরিস্ফুটনের ন্যায়—এ গৃহে অতুলের অশান্তিময় হৃদয়ে এক শান্তিময় নক্ষত্র ফুটিল। সে নক্ষত্র কুমুদিনী। কুমুদিনী বালিকা—পরম সুন্দর চঞ্চল বালিকা। তাহার প্রস্ফুটিত সুগৌর মুখ খানি সর্ব্বদা হাসিময়। সে কখন চঞ্চল ভাবে গাইত, কখন হাসিত, কখন নিতান্ত শিশুর ন্যায় কত পাগলামী করিত। বিজলীর আলো যেন সর্ব্বা মুখে পড়িয়া

রহিয়াছে—তাহার তাড়িত প্রবাহে অতুলের স্নেহময় হৃদয় চমকিয়া উঠিত। কুমুদকে পাগলামী করিতে দেখিলে, অতুলের ইচ্ছা হইত পাগলীকে একবারে কোলে তুলিয়া লয়। কোলে তুলিয়া পাগলীকে স্নেহভরে রাশি রাশি চুম্বন করে। অতুলের বাল্য জীবনও এই ভাবময় ছিল; কুমুদের চঞ্চল ভাব যেন তাহার হৃদয়ের নির্ব্বাপিত তরঙ্গকে আবার উদ্বেলিত করিত। অতুলের ভাবে আর কুমুদিনীর ভাবে বড় মিশিল। অতুল ভাবিত কুমুদিনী তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী। কুমুদ এখন তাহার নিকট পাঠ শিখে। কুমুদকে শিক্ষা দিতে তাহার বড় সুখ। সরল বালিকাও অতুলের নিকট পাঠ বলিতে বড় ভাল বাসিত। অতুল স্নেহ করিয়া, কখন কুমুদিনীর কবরী বাঁধিয়া দিত; কখন ফুল কুড়াইয়া দিত; কখন বাগানে লইয়া যাইয়া, তাহার নিকট ঐশ্বরিক শিল্পের চমৎকারিতা ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার সরলচিত্তে ধর্ম্মভাব প্রোথিত করিত। কখন প্রকৃতি বর্ণনে ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া বালিকাকে শিখাইত। বালিকার সুখের সীমা থাকিত না। কুমুদিনী দাস দাসীকে অতুল চন্দ্রের কোন কার্য্যে প্রায় হস্তক্ষেপ করিতে দিত না। সংসারে এমন পরিচারিকা কজনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

কান্তি বাবুর সংসারে থাকিয়া, অতুলচন্দ্রের আরও একটী রত্নলাভ হইল। সর্ব্বাপেক্ষা এই রত্ন তাহার অধিক শান্তির কারণ হইল। সতীশচন্দ্র অতুলের বন্ধু, অতুলের সহচর। সতীশ কে? সতীশচন্দ্র শ্যামপুরের একজন আঢ্য লোকের সন্তান। তাহার পিতা মাতা কেহ বর্ত্তমান ছিলেন না। মা অনেক দিন হইল মরিয়াছেন। পিতা মরিবার সময় কান্তি বাবুর হাতে সতীশচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছেন। কান্তি বাবুও তাহাকে পুত্রের ন্যায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন। বিষয় ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

অনেক দিন হইতে কান্তি বাবু স্থির করিয়াছেন, সতীশের হস্তে কুমুদিনীকে সমর্পণ করিবেন। সতীশ কুমুদিনীর ভাবী বর। কুমুদিনী সতীশের ভাবী স্ত্রী। কুমুদ কিন্তু সতীশকে "দাদা" ভিন্ন আর কিছু ডাকিত না। তাহাতে দোষ কি ? ভাবী বরকে দাদা ডাকিতে কি দোষ আছে ?

সতীশ বড় শান্ত প্রকৃতি, বড় গম্ভীর। বাল্যকাল হইতেই তাহাতে চঞ্চলতা ছিলনা, দুর্ব্বলতা ছিলনা; বাল্য হইতেই সে স্থির শান্ত। বাল্য হইতেই ধর্ম্মে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, তাহার হৃদয় যেন সংসার সুখের জন্য উন্মত্ত নয়; উহা যেন জগতের কোন অনুদ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সচরাচর মানুষ যে সুখের জন্য লালায়িত, সচরাচর মানুষ যাহাই সংসারের একমাত্র অবশ্য সম্পাদনীয় বলিয়া মনে করে, তাহার হৃদয়ের গতি কেবল তাহাতেই নিবদ্ধ ছিল না। বাল্য হইতেই তাহার হৃদয়ের গতি অন্যরূপ। সতীশের হৃদয় প্রশস্ত, স্বভাব উদার ও অতি মহৎ।

এই কল্পনার দাস হইলেও সমাজ সংসারের জন্য সে বড় লালায়িত ছিল। কি করিয়া গ্রামের উন্নতি হইবে, কি করিয়া সমাজ মার্জ্জিত হইবে, বাল্য কাল হইতেই সতীশ সে সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত। সমাজের প্রতি তাহার বড় ভাল বাসা। সমাজের মঙ্গল সাধনে আপন প্রাণ ব্যয় করিতেও সতীশ প্রস্তুত। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলের স্থির বিশ্বাস— উত্তর কালে সতীশ একজন মহৎ লোক হইবে।

চুম্বকে যেমন চুম্বক আকর্ষণ করে; নির্ম্মল চরিত্র যুবক দুইটীর নির্ম্মল হৃদয় দুই খানিও সেরূপ পরস্পর আকৃষ্ট হইল। উভয়েতে যেন কি এক বন্ধন হইল। উভয়ে উভয়কে পাইয়া, উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বড় সুখী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শৈবালের কি হইল? অতুলচন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিয়াছে; হতভাগিনী শৈবালের দশা—এখন কে বুঝিবে? হৃদয়ে কষ্ট হউক, হৃদয় নিরাশায় মথিত হউক, অতুলচন্দ্র পুরুষ, অতুলচন্দ্র স্বাধীন। সে অনায়াসে গৃহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে। তাহার চক্ষু উন্মিলীত; সংসারের চিত্র দেখিয়া, সে আপন হৃদয়ে প্রবোধ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু শৈবালের ত কিছুই নাই। তাহার যাহা আছে তাহা অতুলচন্দ্র। তাহার সুখ সম্পত্তি অতুলচন্দ্র। অতুলচন্দ্র তাহার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল। অতুলচন্দ্রের গৃহ ত্যাগের সহিত তাহার সমস্ত ফুরাইল।

অতুল গৃহে থাকিলেও ত শৈবাল শাশুড়ীর বিষ দাহনে দগ্ধ হইত। পাঠক! হইত সত্য। কিন্তু অতুলকে দেখিলে, সেই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা তাহার মনে থাকিত না। অতুলকে দেখিলে সে মনে ভাবিত, সংসারে তাহার জন্ত কোন কষ্ট নাই। অতুলের সম্মুখে বসিয়া, সে তাহার কোমল হৃদয়ের উপর ইন্দ্রের বজ্রাঘাত সহ্য করিতে পারিত। অতুলকে দেখিতে দেখিতে, সে গভীর তরঙ্গায়িত মহাসাগর বুকে ঝাঁপ দিয়া, তাহার সবেগ তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে পারিত। অতুল কাছে থাকিলে, শৈবাল তাহার মস্তকোপরি হিমাদ্রি-শিখর-পতন অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত। শৈবাল অতুলময়ী; অতুলের স্নেহে সে উন্মাদিনী। তাহার একদিকে অতুল, অপর দিকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা—শৈবাল তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করিত।

আজি সে অতুল কোথায়? শৈবাল তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অতুলের চিঠী পাইলে, শৈবাল তাহার হৃদয়ের বল,

হৃদয়ের ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার একখানা চিঠীও শৈবাল পাইল না। কত দিন চলিয়া গিয়াছে, অতুলের বার্ত্তা না পাইয়া, শৈবাল বড় কাতর হইয়া পড়িল। কত সন্দেহ আসিয়া তাহার মনে ক্রিয়া করিতে লাগিল। একদিকে অতুলের চিন্তা—অপর দিকে কাদম্বিনীর জ্বালাতন; সোণার প্রতিমা দুই আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল।

অতুল প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছিল; তাহাতেই শৈবালকে না জানাইয়া, না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল: শৈবালকে যে সর্পবিবরে রাখিয়া গিয়াছে, বালিকা আর তাহার দংশন সহ্য করিতে পারিতেছে না। পাঠক! খুঁজিয়া দেখিও, বঙ্গ-সংসারে এইরূপ সর্পবিবর অনেক দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে, সেই বিবর বাসিনী সর্পিণীগণের বিষদংশনে শত শত সোণার প্রতিমা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

পাঠক! অতুলচন্দ্রকে ঘৃণা করিও না—হৃদয় হীন পাষণ্ড মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করিও না। অতুল এখনও সংসারানভিজ্ঞ তরুণ যুবক—তরুণ বয়সোচিত চঞ্চলতায় পরিচালিত। একবার শুনিয়াছ, অতুলের হৃদয় আপনা আপনি শৈবালে বিন্যস্ত ছিলনা। শৈবাল সরলতা বলে, সুন্দর চরিত্র বলে, অতুল সাম্রাজ্যের অনেক ভাল জিনিষ অধিকার করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা ষোল আনা রকমে দখল করিতে পারে নাই। কি যেন বাকি রহিয়াছিল। তাহা তুমি বুঝিবে না; আমরা বুঝিব না; বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি না করিলে অতুলও তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহা অন্যের বোধাতীত।

প্রকৃতি প্রত্যেক মানব হৃদয়ে এক আকর্ষণ প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন। অবস্থা ভেদে কাহারও আকর্ষণ সবল, কাহারও আকর্ষণ দুর্ব্বল। সমান আকর্ষণশালী দুইটী হৃদয় পরস্পর সাক্ষাতে আপনা আপনিই

আকৃষ্ট হইয়া মিশিয়া যায়। এই আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, যত্ন করিতে হয় না, একবার মাত্র দর্শনেই উহা মিশিয়া যায়। অতুল-চন্দ্রের হৃদয়াকর্ষণ বেগময়, শৈবালের আকর্ষণ মৃদুশীল। তাহাতেই শৈবাল আকৃষ্ট হইয়া অতুলচন্দ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। শৈবালের হৃদয় অতুলচন্দ্রময়; সে আপনাকে বুঝিতে পারে না; সে কষ্টে থাকিয়াও অতুল রত্ন পাইয়া সুখী। অতুলচন্দ্র শৈবালে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। শৈবাল দুর্ব্বল আকর্ষণ বলে যাহা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, কেবল মাত্র তাহাই অতুলচন্দ্র হইতে লইয়াছে। কিন্তু অতুল চন্দ্রকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। শৈবালকে দিতে অতুল চন্দ্রের যাহা বাকী আছে, অতুলচন্দ্রের তাহা দান করিবার ক্ষমতা নাই। তাহার কেহ দান কর্ত্তা নাই; অবস্থান্তরে উহা আপনিই যাইয়া অন্যের আয়ত্ত হয়।

তবে কি শৈবাল! তুমি সুন্দরী নও? শৈবাল! তুমি কি মনে কর, তোমার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে অতুলচন্দ্রের রূপ তৃষ্ণা নিবারিত হয় না? যদি কথনো মনে এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাক; তবে শৈবাল, একখানা দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া, স্থিরচিত্তে তুমিই তোমার সৌন্দর্য্যের সমালোচনা কর। অই দেখ শৈবাল, দর্পণের দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার স্থির প্রশান্ত নয়ন দুইটী কেমন স্বর্গের জ্যোতি বাহির করিয়া দিয়াছে। তোমার সুন্দর মুখে কেমন পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে। দেখ, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, তোমার স্নেহময় মুখখানি যেন জগতকে কি আত্মোৎ-সর্গের শিক্ষা দিতেছে। দেখ তোমার বিপুল-কৃষ্ণ কেশদামে কেহ কথন আদর করিয়া, কবরী বাঁধিয়া দেয় নাই; তবু তাহারা অযতনে ছড়াইয়া তোমার দেহের কি সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে শৈবাল, সে স্থান আরো সুন্দর;

সেস্থান আরো মনোহর, মাধুর্য্যময়। দেখ, সেই সুন্দর গৃহ একমাত্র অতুল চন্দ্রের মূর্ত্তিতে ভরিয়া রহিয়াছে। সে মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে সুন্দর ভালবাসা, সুন্দর স্নেহ, সুন্দর ভক্তি, সুন্দর প্রীতি। তোমার হৃদয় মন্দির পরম সুন্দর দেব গৃহ! অতুলের সুন্দর মূর্ত্তি সে গৃহে আরাধ্য দেবতা। স্বামী মূর্ত্তি হৃদয়ে ভরিয়া, তাহা দেবগৃহ করাপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কি সৌন্দর্য্য আছে? শৈবাল! বাহ্যদৃশ্যে তুমি সুন্দর, অন্তরদৃশ্যে তুমি ততোধিক সুন্দর। তোমার মন সুন্দর, তোমার হৃদয় সুন্দর, তুমি স্থির ও শান্ত। তোমার হৃদয় গম্ভীর, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য। কিন্তু হতভাগিনী, তবু তোমাতে যেন কি নাই। অতুলের হৃদয় বলিতে পারে না, অথচ যাহা চায়, যাহা পাইলে অতুল উন্মত্ত হইয়া তোমাতে ডুবিতে পারিত; তোমাতে যাহা থাকিলে, তুমি অতুলের হৃদয়ময়ী হইয়া থাকিতে, তাহা যেন তোমাতে নাই। এই দোষ তোমার নয়; দোষ অতুলের নয়; নির্দ্দেশ করিলাম বলিয়া এ দোষ আমাদেরও নয়। এ দোষ কতক প্রকৃতির, কতক অতুলের কাল্পনিক শিক্ষার।

শৈবাল! তুমি সরল, আমাদের কুটীল কথা তুমি শুনিও না। তোমার যাহা বিশ্বাস আছে, তাহা যেন দূর না হয়। "অতুলচন্দ্র তোমার" এ বিশ্বাস মনে রাখিও, তোমার হৃদয়ে জ্বালা যন্ত্রণা থাকিবে না।

শৈবাল এখন একা। কাদম্বিনীর বিষ দাহন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হতভাগিনী বঙ্গ-গৃহ-পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী শৈবাল জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল। অতুল গৃহে নাই, আপনার দুঃখ কাহাকে বলিবে? কাহাকে দুই দণ্ড বসিয়া হৃদয়ের কথা বলিয়া, এ কষ্টভার লঘু করিবে? কিছু বলিত না, কিছু করিত না, প্রাণের বেদনায় কাঁদিতে চাহিলে, কাদম্বিনী আরো জ্বালা যন্ত্রনা দিত। কাদম্বিনী এখন সময়ে

সময়ে শৈবালকে প্রহার করিয়াও আপনার ক্রোধ নিবারণ করিতে লাগিল।

শৈবালের আহার নিদ্রা কমিয়া আসিল। সোনার প্রতিমা শৈবাল-কুসুমে কীট পশিল। তাহার মুখ মলিন হইতে লাগিল। শৈবাল দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একদিন রজনীতে কি হইয়া গেল, কাহার বুদ্ধিবলে এই পরামর্শ স্থির হইল, তাহা ভগবান জানেন; আমরা তাহা কি করিয়া বুঝিব? রজনী প্রভাত হইয়া গেল; প্রতিবেশী সকলে জাগ্রত হইয়াছে; কাদম্বিনীর কলকণ্ঠ সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী অবারিত কণ্ঠে, সুমধুর সম্ভাষণে বধূর প্রতি গালি বর্ষণ করিয়া, স্নেহ প্রকাশ করিতেছে। পরমারাধ্যা পিতামহী ঠাকুরাণী তাহাতে সায় দিয়া, তাহার ধূয়া বজায় রাখিতেছেন। পাড়ার লোকে ভাবিল, আজি কি এক থানা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে।

রৌদ্রকিরণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিল। প্রতিবেশিনী দিগের মধ্যে দুই একটী করিয়া, অনেকে কাদম্বিনীর বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাদুর মা, ঈশানের খুড়ী, নিমাইর বউ, রমাকান্তের মাসী, পেলার মা, রাণীর পিসী, ভগানন্দীর বউ, গঙ্গা, বিন্দি, কাদম্বিনীর মামার শ্বশুরের পিসতুত ভাইয়ের দিদি শাশুড়ীর মাসতুত ভগ্নী প্রভৃতি নিতান্ত নিকটস্থা আত্মীয়ারা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে

দেখিতে অনুপূরক অব্যয়ে ঘরপূর্ণ হইয়া গেল। কাদম্বিনীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

বঙ্গগৃহে প্রতি গৃহিণীদিগেরই কতকগুলি অনুপূরক অব্যয় আছে। কলহকারিণী মানিনী ভামিনী কোন গৃহিণী সাপিনীর, কলহ প্রাগল্ভতায় কোন অভাব দেখিলে, ইহারা আপনাদের রচনা চাতুর্য্যবলে তাহার অনুপূরণ করিয়া থাকেন। কেহ কলহান্তে গৃহিণীর প্রশংসা করিয়া তাঁহার তৃপ্তির অভাব অনুপূরণ করেন। কেহ বা কলহ বর্ত্তমানেই গৃহিণীর ধুয়া ধরিয়া, তাহার বাক্য বিন্যাসের অভাব অনুপূরণ করিয়া থাকেন। কেহ কলহের উপসংহার হইলে, বাড়ী ফিরিবার সময় বধূদের দোষ রটনা করিয়া, গৃহিণীর দোষ রটনা শক্তির কোথায় অভাব থাকিলে, তাহারি অনুপূরণ করিয়া থাকেন। ইহাদের কাহারও কিছু মাত্র ব্যয় করিতে হয় না, বরং কলহান্তে মাঝে মাঝে কিছু লাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই ইহাদিগকে আমরা অনুপূরক অব্যয় শব্দে আখ্যা দিলাম। ভাষাতে ইহাপেক্ষা এই গদাধরীদের অন্য কোন সংজ্ঞা নাই।

পাড়ার মেয়ে ছেলে দিগকে আসিতে দেখিয়াই, পিতামহী ঠাকুরাণী ত্বরিত হস্তে মালা লইয়া, গৃহের এক প্রান্তে যাইয়া বসিলেন। মুখ গম্ভীর, কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত নাই—সুবিধা বুঝিয়া এক এক বার হংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন, আর একান্ত মনে ভগবানের নাম জপ করিতেছেন। এ কলহের তিনি বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

কাদম্বিনীর কলকণ্ঠ সকলকে জানাইল; শৈবাল তাহাকে মারিয়াছে। গদাধরীদের মধ্যে এক জন বলিল "ওমা! এমন বউত দেখি নাই যে, শাশুড়ীকে মারে। ঠাকুর! দেখ যে, একেবারে গেল।" কাদম্বিনী শরীরের একস্থান দেখাইয়া বলিল "দেখুন কিরূপ মারিয়াছে। আমি

শাশুড়ী, তাই কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলি না।” গদাধরীদের মধ্যে আর একজন এই কথার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল “তাইত এমন শাশুড়ী, তোমাকে মা'র মত স্নেহ করে। তুমি তাকে গালি দেও, মার। বউ! তোমার লজ্জা কি একেবারে গিয়াছে? এই শাশুড়ী তোমার জন্য কত করে। মা আর শাশুড়ীতে কি প্রভেদ আছে? ছি! ছি! বউ হইয়া তোমার এই কায।”

কাদম্বিনীর চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল। পাপিয়সী, এ সংসারে তোমাদের কিছুই অসাধ্য নাই। এ সংসারে তোমরা না করিতে পার এমন কায নাই। শোক নাই, সন্তাপ নাই, তবু চক্ষু কোটর হইতে দর দর চক্ষুজল বাহির করিয়া, লোককে জানাইলে তোমার হৃদয়ে বড় দুঃখ।

পিতামহী ঠাকুরাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া, ভগবানের নাম জপ করিতে ছিলেন; এখন আর কাদম্বিনীকে উপদেশ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মালার থলি হইতে একটী কথা বাহির করিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিলেন “ছি কাদু, ঘরের কথা কাহাকে বলিতে নাই। বউ শাশুড়ীকে মারে, এ কথা কি আর কাহাকে বলিতে আছে? আমার সঙ্গে যে, অতুলের বউ কত খারাপ ব্যবহার করে, তাহা কি আমি কাহাকে বলি? এইত সে দিন ভাতে কি মিশাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাত আমি কাহাকেও বলি নাই। ওসব কথা কাহাকেও বলিতে নাই।” এই বলিয়া গম্ভীর ভাবে পুনরায় ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মেয়ে ছেলেরা ভাবিল কি ভাল মানুষ।

এক গদাধরী একটা কৌটা হইতে কতকগুলা তামাকের গুঁড়া বাহির করিয়া, দন্ত ঘষিতেছিলেন। তিনি দন্ত ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন “কাঁচা শাশুড়ী তাই এত সহ্য করে। আমার এমন বউ হইলে আমি গলা টিপিয়া

মারিতাম"। তিনি তামাক গুঁড়া সুশোভিত মুখে বিকট ভঙ্গি করিতে করিতে, বাস্তবিকই যেন কাহারো গলা টিপিয়া মারিলেন বলিয়া, এক বিকট ভঙ্গির অভিনয় করিলেন। আর এক জন "নারায়ণ, ঠাকুর, দেব, ধর্ম্ম, মা মনসা" প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ প্রয়োগে, "দেশ যে একেবারে রসাতলে গেল, সংসারে যে ঘোর কলিকাল উপস্থিত" বলিতে বলিতে বারম্বার আক্ষেপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এবার পিতামহী ঠাকুরাণী কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "হায়! আমাদের সেকাল আর এখনকার একাল!" তিনি আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

শৈবাল ঘরে বসিয়া এ সমস্ত কথা শুনিতেছিল। কাহারো কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিল না। কাদম্বিনীর কলকণ্ঠ রহিয়া রহিয়া বাজিতে লাগিল।

অতুলচন্দ্র কোথায় কি জন্য গিয়াছে, পাড়ার লোকে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। কাদম্বিনী ভণিতা করিয়া বলিল "ছেলেটা ত দুই চক্ষের কোণেও দেখিতে পারে না। তাহাতে আবার স্বভাবে দোষ পাইয়াছে; পাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন একবার আর ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না।" শুনিয়া রমাকান্তের মানী, ভগানন্দীর বউ, রাণীর পিসী, ঈশানের খুড়ী, বিবি, গঙ্গা প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যধারিণী বিধবারা, (ইহাদের সম্বন্ধে পাড়ার লোকেরা কত কথা বলিত) কেহ চক্ষু কোটর সম্পূর্ণ দেখাইবার জন্য চকিত নয়নে, কেহ হা করিয়া উঠিয়া বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইলেন। রাণীর পিসী একেবারে নাকে মুখে কাপড় চাপিয়া ধরিলেন—যেন কিসের দুর্গন্ধ পাইয়াছেন। শুনিয়া রমাকান্তের স্ত্রী বলিলেন "ঠাকুর, এখন মরিতে পারিলেই বাঁচি।" ভগানন্দীর বউ (দুষ্ট বালকেরা ইহাকে ব্রজ গোপিনী বলিয়া উল্লেখ করিত) গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে একজনকে বলিল "ইহাদের শরীরের বাতাস গায় লাগিলেও

পাপ।" বিধি একেবারে লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কাদম্বিনী তাহাকে আবার যত্ন করিয়া বসাইল। যাঁহারা আশে পাশের লোক, শৈবালকে জানে শোনে, তাহারা এ কথায় বিশ্বাস করিল না।

পিতামহী ঠাকুরাণী আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভগবান আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। এবার তিনি একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাদম্বিনীর সম্মুখে যাইয়া, তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "কাদু, এখন চুপ্ কর। ঘরের দোষ কি পরকে বলিতে আছে? আমার চক্ষের উপর কত কাণ্ড কারখানা হইয়া যাইতেছে, তাহা ত আমি তোমাকেও এ পর্য্যন্ত জানাই নাই। এ সমস্ত কথা ঢাকিয়া রাখাই ভাল।" এই বলিয়া তিনি নীরব হই-লেন। আবার পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া থলিতে হাত ভরিয়া, ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বিধি বলিল "আহা! কি ভাল মানুষ! নিজের নাতিনীর জ্বালা যন্ত্রণায়ও মনে কোন হিংসার ভাব নাই।"

এ কথা শুনিয়া শৈবালের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তোমরা জান, অতুল কেন গৃহত্যাগ করিয়াছে, গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে শৈবাল তাহার কিছুই জানিত না। কাদম্বিনীর আজিকার কথায় তাহার মস্তকে যেন বজ্র নিপতিত হইল। ভাবিল কাদম্বিনী তাহার প্রতি অতুলচন্দ্রের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অতুলের ভালবাসায় শৈবাল যে অভাব সন্দেহ করিয়াছিল, আজি যেন তাহা দেদীপ্যমান দেখিতে লাগিল। আজি যেন শৈবালের জ্ঞান হইল, অতুল আর তাহার নয়। শৈবাল আর পারিল না, দিশাহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাদম্বিনীর কণ্ঠের শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। পূজার বলিদান হই-য়াছে; শঙ্খ ধ্বনি একটু থামিল। অনুপূরক অবাবদিগের সকলেই

বাড়ী যাইতে ব্যস্ত। কাদম্বিনী তাহাদিগকে অতি যত্নে বসিতে আসন দিল। পরে কাহাকে এক খণ্ড কুমড়া, কাহাকে একটু লাউ কাহাকে অন্য কিছু দিয়া বিদায় করিল। তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার সময় লোকের নিকট বলিয়া গেলেন "ভুবনের বউ কেমন ভাল মানুষ, কত সচ্চরিত্র, কেমন শান্ত প্রকৃতি। আহা হা! এমন শাশুড়ীকে বউটা কত জ্বালাতন করে"। নিমাইর বউ কাদম্বিনীর দুঃখে একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল। ঈশানের খুড়ীর কুমড়া খণ্ড একটু ছোট হইয়াছিল, সে বলিল "সকল দোষও বউটার নয়। সেত আমাদের সম্মুখে কথাটীও বলিল না।"

শৈবাল বসিয়া চক্ষুজলে মুখ ভাসাইতেছিল। আজি শৈবাল হৃদয়ের বেদনা রাখিতে স্থান পাইতেছে না। কাদম্বিনীর তাহাও সহ্য হইল না। সে গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল "কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমঙ্গল আনিস্ না। ইচ্ছা হয় বাহিরে যাইয়া কাঁদ্।"

ক্রন্দন দুঃখার্ত্ত হৃদয়ের পরম শান্তি। হৃদয় দারুণ শোকভারে, দুঃখভারে আক্রান্ত হইলে যদি, প্রাণ ভরিয়া, চীৎকার করিয়া, দুই দণ্ড কাঁদিতে পারি, তবে হৃদয় ভার লঘু হয়। মনে করি ক্রন্দন ধ্বনির সহিত হৃদয়ের আগুণ অনেক বাহির করিয়া দিয়াছি। যে শোক দুঃখে কাঁদিতে পারে না, তাহার হৃদয়ের আগুণ সমভাবেই রহিয়া যায়। চক্ষুজল কি? চক্ষুজল আর কিছুই নয়, উহা হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাণকারী শান্তি-প্রবাহ, হৃদয় ধোয়াইয়া নয়ন পথে বাহির হয়। যে শোকার্ত্ত হৃদয়ে চক্ষুজল নাই, তাহার হৃদয় বহ্নি চির প্রজ্বলিত। সে বহ্নির নির্ব্বাণ নাই। প্রিয় পাঠক, প্রিয় পাঠিকা, শোকের সময়, হৃদয়ের দুঃখের সময়, কেহ কাঁদিতে বসিলে, তোমরা তাহাকে সান্ত্বনা করিও না। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া, তাহাকে তাহার হৃদয়ের ভার লঘু করিতে দিও। তাহার হৃদয় শান্ত হইবে।

শৈবালের প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনীর তর্জ্জন গর্জ্জনে কি তাহার চক্ষুজল থামিতে পারে? এইবার কাদম্বিনী শৈবালকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া বলিল "যা, ঘরের বাহিরে যাইয়া কাঁদ। এই ঘরে বসিয়া কাঁদিতে পাইবি না।" দুঃখিনী অধিকতর পীড়িতা হইয়া, দীনস্বরে ডাকিল "মাগো! আমাকে নেও।" কাদম্বিনী আবারো বলিল "আবার কাঁদিতেছিস্ কোন্ মুখে? আমি হইলে এখনই বিষ খাইয়া মরিতাম। স্বামী বেটা অসচ্চরিত্রা বলিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আমি হইলে কি, কাহাকেও মুখ দেখাইতাম? এখনই জলে ডুবিয়া বা বিষ খাইয়া মরিতাম।"

শৈবাল আজি কিছু খাইল না। আজি সমস্ত দিন বসিয়া কাঁদিল। সন্দেহ মনে কাদম্বিনী অতুলকে কিছু বলিয়াছে। অতুল তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। শৈবাল মনে ভাবিল "তবে আমি বাঁচিব কেন?"

শৈবালের হৃদয়ে এমন কিছু ছিল না, যাহা অতুলের অজ্ঞাত ছিল। অতুল ভুলিয়াও কখন শৈবালকে অবিশ্বাস করে নাই। আজি শুধু অবিশ্বাস নয়, আজি শৈবালের চরিত্রে তাহার সন্দেহ! শৈবাল ইহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? আজি শৈবাল ভাবিল, সংসারে মহা প্রলয় উপস্থিত।

ক্রমে ক্রমে পাড়ার বালক বালিকারা শৈবালের নিকট আসিয়া উপস্থিত। শৈবাল এখন ও কাঁদিতেছে! সেই ছোট বালকটী শৈবালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল "ছৈবাল খুণী, টুই কাঁডিস্ কেন? টোকে কে মেলেছে?" স্নেহের প্রতিমা, সরলতার মূর্ত্তি শৈবাল এই দুঃখের সময়ও সুরেন্দ্রকে কোলে তুলিয়া লইল। চক্ষু জল মুছিয়া বলিল" বাবারে! আমাকে কেহ মারে নাই"। বালকটী শৈবালের মুখ পানে চাহিয়া, তাহাকে অস্পষ্ট ভাষায় কত কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বালকের মুখ খানা দেখিয়া, শৈবালের চক্ষু হইতে আরো জল পড়িতে লাগিল। বালিকারা অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

শৈবাল আজি প্রত্যেক বালক বালিকাকে একবার করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। প্রত্যেককেই কতক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়া, প্রত্যেককেই বার বার স্নেহ চুম্বন করিল। এ বালক বালিকাগণ শৈবালের বড় আদরের ধন; বড় স্নেহের সামগ্রী। কয়েকটী বালিকা শৈবালের ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিল। অপর ঘরে আবার কাদম্বিনীর কলকণ্ঠ শুনা গেল। শৈবাল বলিল "বেলা হইয়াছে, এখন ঘরে যাইয়া কিছু খাও"। বালক বালিকারা কাদম্বিনীর ভয়ে অনিচ্ছায় বাড়ী চলিয়া গেল। তাহারা বালক বালিকা, কিছু জানে না; বাড়ী যাইয়া আপন আপন মাকে বলিল "কাদম্বিনী আজ শৈবালকে বড় মারিয়াছে, বড় গালি দিয়াছে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। চাঁদ পূর্ব্ব আকাশ হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া, মধ্য আকাশে আসিয়াছেন। গাছে গাছে, পাতায় পাতায় সকল স্থানে জ্যোৎস্না পড়িয়া পৃথিবী সমুজ্জলা—প্রকৃতি সমুজ্জলা। চাঁদের কাছে নক্ষত্র বেচারারা প্রায় সকলেই হীনপ্রভ। কেবল উজ্জল কয়েকটী বৃহৎ নক্ষত্র এখনও নিতান্ত সাহসে ভর করিয়া, আকাশের কোণে প্রস্ফুটিত। রাত্রি এখন দ্বিপ্রহর। গ্রাম সহরের ন্যায় কোলাহলময় নয়। তাহাতেই চারিদিক নিস্তব্ধ।

লস্করপুরের একটী উদ্যান গৃহে এই সময় বড় উচ্চ হাসির তরঙ্গ

উঠিতেছিল। একজন বলিতেছে "বাবু, আপনার প্রসাদে আমরা কত কি করিলাম। বেঁচে থাক বাবা।" আর এক ব্যক্তি অমনি বলিয়া উঠিল "বাবা কিরে বেটা শ্যালা? বাবু যে আমাদের বাবার বাবা, তস্য বাবা।" "তবে বাবা, চরণ দাও।" এই বলিয়া কয়েকটী লোক সুরেশ বাবুর পদপ্রান্তে প্রণত হইল। বাবুও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রণত হইলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পদপ্রান্তে এক বার প্রণত হইয়া পদধূলী গ্রহণ করিল। আজি কেহও কাহার নিকট ছোট বড় নয়। আজি সকলেই সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছে। সুরাদেবী সকলের হৃদয়েই আজি এক অপূর্ব্ব ভাব উচ্ছাসিত করিয়াছেন।

গৃহটী সুন্দর সজ্জিত। ঝাড় লণ্ঠনে চারি দিক আলোকিত। গৃহবাসী সকলেই অপরিমিত উৎফুল্ল। সম্মুখে কতকগুলা কাচের গ্লাস, দশ বার বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা জলপাত্রে জল রহিয়াছে। সকলেই আনন্দে ব্যাকুল। কেবল মাত্র এক ব্যক্তি এখন পর্য্যন্ত নীরব। ইনি নবাগত। এক জন মাতাল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "কি বাবা ভোলনাথ খুড়া, চুপ করিয়া আছ যে?" আর এক জন বলিল "দে ব্যাটা শ্যালা, ভোলানাথ খুড়াকে এক গ্লাস ঢালিয়া দে। দে শীঘ্র দে।" অমনি বোতল হইতে সুবর্ণ বরণা দ্রবময়ী উৎফুল্ল কারিণী সাম্য-মাতা সুরাদেবী গ্লাসে অবতীর্ণা হইলেন। এক জন মাতাল তাহা ভোলানাথ বাবুর সম্মুখে ধরিল। তিনি অনিচ্ছায় অসম্মত হইলেন। এবার সুরেশ বাবু স্বয়ং ভোলানাথের সম্মুখে গ্লাশ ধরিয়া বলিলেন "ভোলানাথ বাবু! আমার হেল্‌থ্‌ ড্রিঙ্ক্‌ কর"। এইবার তিনি গ্লাসটী হাতে লইলেন। একবার গ্লাসের দিকে চাহিয়া, আবার একটু অনিচ্ছায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারিদিক হইতে রাশি রাশি অনুরোধ, রাশি রাশি উৎসাহ আসিতে

লাগিল। আর তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না; একটানে গ্লাসস্থ ব্রাণ্ডি একবারে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। সকলে একবাক্যে "সাবাস্ বাবা, সাবাস ছেলে" বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিল। একবেটা মাতাল আহ্লাদে আটখানা হইয়া, একেবারে আসিয়া, ভোলানাথের কাঁধে চাপিয়া বসিল। অপর এক মাতাল একবারে তাহার সম্মুখে যাইয়া নাচিয়া ফেলিল।

সুরা দেবীর কি অপার মহিমা, সুরা দেবীর কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি, কি প্রভাব! পানকরা মাত্রই ভোলানাথের মুখে হাসি ফুটিল; কপট গম্ভীর ভাব দূর হইল। এখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার মুখ হইতে রসের কথা সকল বাহির হইতে লাগিল। চক্ষু দুইটী নিবি নিবি হইয়া আসিল। গ্লাসের পর গ্লাস চলিতেছে; সকলেই এখন মাতাল।

একটু পরে একজন ভৃত্য কতকগুলি খাওয়ার সামগ্রী লইয়া উপস্থিত। থালায় থালায় ভাজা মাংস ইত্যাদি আসিয়াছে। দেখিয়া ভোলানাথ বাবু বলিলেন "সুরেশ বাবু, আসুন, আজি আমরা ভৈরবী চক্র করি।" মাতালেরা সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। খাদ্য সামগ্রী ও মদের বোতল ইত্যাদি মধ্যে রাখিয়া, মাতালের দল চক্রাকারে ঘিরিয়া বসিল। ভোলানাথ পাত্রে পাত্রে মদ ঢালিয়া বলিলেন;—

"প্রাপ্তি হি ভৈরবে চক্রে সর্ব্ব বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ
নিবৃত্তি ভৈরবে চক্রে সর্ব্ব বর্ণা পৃথক্ পৃথক্।"

এক জন ভোলানাথের মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "বেশ বলেছ তো বাবা।" আর একজন বলিল "বাবা এযে কুমারের শ্লোক।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল "না বাবা বেশ বলেছ, খুব বলেছ, আচ্ছা বলেছ।" ইহা, বলিয়া সে একেবারে ভোলানাথ বাবুকে চুম্বন করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ মাতাল বলিল, "হেণ্ড্ সেকিং কর বাবা।"

সকলে উঠিয়া ভোলানাথের সহিত হেণ্ড্ সেকিং করিল। একজন মাতালের সম্মুখে সুরেশ বাবুর পোষা বিড়ালটী বসিয়া আছে। সে জল তৃষ্ণায় বিড়ালটীর গলা ধরিয়াই মুখের উপর বিড়ালটীকে উপুড় করিয়া জল ঢালিতে লাগিল। বিড়াল-শ্বাস কষ্ট পাইয়া, নখ দিয়া তাঁহার কতক গুলা গোঁপ ছিড়িয়া ফেলিল। মাতাল ব্যাথা পাইয়া বিড়ালটীকে আর এক জন মাতালের নাকের উপর নিক্ষেপ করিল। তাহারও একটু কষ্ট হইয়াছে। সে বলিল "বেটা-চ্ছেলে বিড়াল ঢালিয়া জল খাইতেছিস্।" ঘরে বিষম হাস্যধ্বনি হইল। এক জন মাতাল এক বেটা চাকরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তোমার নোলক কোথায় মা?" আর এক জন মাতাল ভোলানাথের গোঁপে হাত দিয়া বলিতেছে "ভোলানাথ খুড়া, তুমি এই পিতুলা গোঁপ জোড়াটা কোথায় খরিদ করিলে?" মাতালদের মধ্যে এরূপ নানা প্রকার কথা চলিতেছে। নেশার জোরে এক জন মাতালের চক্ষু দুটী নিবি নিবি করিতেছিল। অন্য এক জন মাতালের তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে: সে আর থাকিতে পারিল না; হৃদয়ের স্ফুর্ত্তি ভরে গান ধরিল;—

"তারা গো ত্রিনয়নী তোমার চোখ্ দুটি যে,
দেখ্‌তে পাইনে।
একবার দেখা দে মা চোখ্ মেলিয়ে এ সংসারে
আর কিছু চাইনে।
রেখে শিবে পদতলে, দাঁড়ায়েছ জিহ্বামুলে
ওমা! মেয়ে হয়ে নেংটা হলে, লজ্জায় মোরা
কথা কইনে।

এক জন মাতাল বলিল "বাবা, ওসমস্ত রাখ, একটা রামপ্রসাদী মালশী গাও।" গায়ক আবার গাইতে লাগিল।

"মা তোমায় কত বাসি ভাল।
বুক জ্বলে যে, যায় গো খেলে, তবু করি অর্দ্ধস্তুল।
সেরী সেম্পেন ধান্যেশ্বরী, নানারূপী সুরেশ্বরী,
ওগো ব্রাণ্ডিতে মহিমা ভারী, আমরা কি বুঝিব বল ?
একবার তোমায় পেটে নিলে, যাই যে গো মা সংসার ভুলে,
রামপ্রসাদ বলে ছিপি খুলে যত পার গলায় ঢাল।"

সকলে একবারে বাহবা দিয়া উঠিল। সকলে একবারে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল "সাবাস বাবা, এমন ছেলে না হলে কি হয় ? ফরমাইস করা মাত্রই প্রস্তুত,একবারে রেডিমেড। বাঁচিয়া থাক বাবা! মাগের মুখ উজ্জ্বল কর বাবা।"

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। সকলেরই শরীর শিথিল হইয়া আসিয়াছে। যে যেখানে বসিয়াছিল, সে সেখানেই শুইয়া পড়িল।

সুরেশ বাবু ও ভোলানাথ ইচ্ছা করিয়াই অনেক মদ খান নাই। তাঁহারা দুইজনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, উদ্যান মধ্যে আসিয়া বসিলেন। সুরেশ বাবু বলিলেন "ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি মোকদ্দমাই হারিলাম। কান্তি বাবু যে, আমাকে জেরবার করিয়া তুলিল।

ভোলা। আপনাকে বলিয়াছি, সেই দুষ্ট ছেলেটা ভয়ানক জুয়াচোর। তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে, আপনি যে, সহজে এই সমস্ত মোকদ্দমায় জয় লাভ করিতে পারিবেন, এইরূপ ভাবিবেন না।

সুরেশ। তাহাকেই বা কেমন করিয়া জব্দ করি ?

ভোলা। যদি আপনি সমুদয় ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত হন ;

বিপদ উপস্থিত হইলে, আমাকে সাহায্য করেন; তবে এই বিষয়ে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

সুরেশ। "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহাতে যত ব্যয় আবশ্যক হইবে সমুদয় আমি বহন করিব। বিপদ উপস্থিত হইলে, আপনাকে প্রাণপণে সাহায্য করিব।" ভোলানাথ সুরেশচন্দ্রকে কাণে কাণে আরও যেন কি বলিলেন। শুনিয়া সুরেশচন্দ্র একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। কিছুকাল পরামর্শের পর উভয়েই আসিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ.

যে দিন কাদম্বিনী শৈবালকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিল; সকলের কাছে শৈবালের দোষ প্রমাণ করিল; যে দিন "শৈবালের চরিত্রে দোষ পাইয়া অতুল তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে" বলিয়া, কাদম্বিনী প্রতিবেশীদের মনে শৈবালের নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল; সেই দিনের রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অন্য দিন রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত না হইতে, শৈবাল গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকর্ম্ম করিত; আজি তাহা করিল না। ক্রমে রৌদ্র উঠিল, বেলা হইতে লাগিল, শৈবাল তথাপি শুইয়া আছে। কাদম্বিনীর মনে সন্দেহ হইল। বেলা যখন কিছু অধিক, তখন কাদম্বিনী অনুগ্রহ করিয়া, শৈবালের শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, শৈবাল শুইয়া আছে; চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ, আপনা আপনি তাহা বুজিয়া আসিতেছে। কাদম্বিনী কঠোর স্বরে শৈবালকে ডাকিল। শৈবাল কোন উত্তর করিল না। তাহার চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল।

কাদম্বিনী শৈবালের আকৃতি দেখিয়াই সকল বুঝিয়াছে। অমনি উঠিয়া যাইয়া, ভুবনমোহন রায়কে চুপি চুপি সকল জানাইল। ভুবনমোহন রায় শশব্যস্তে চলিয়া আসিলেন। শৈবালের শয্যা গৃহে আসিয়া, তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিলেন। শরীরে হাত দিয়া দেখিলেন, শরীর নিতান্ত গরম। "বউ, বউ; বলিয়া ডাকিলেন, শৈবাল কোন উত্তর করিল না। এই বারও শৈবাল কাঁদিল।

ক্রমে শৈবালের যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ক্ষণেক চক্ষু বুজিল, ক্ষণেক চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিল। ভুবনমোহন রায় উঠিয়া গেলেন; কাদম্বিনী উঠিয়া গেল; উভয়ে কি পরামর্শ করিলেন। পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, শেষ রাত্রিতে শৈবালের ওলাউঠা হইয়াছে।

কাদম্বিনী কয়েকটী শিশিতে জল পূরিয়া, শৈবালের বিছানার পার্শ্বে রাখিয়া দিল। আজি শৈবালের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, কাদম্বিনী তাহার কত শুশ্রূষা করিতেছে।

শৈবাল এখনও কথা কহিতেছে। কিন্তু যাহা বলে তাহা মাঝে মাঝে প্রলাপ বাক্যে পরিপূর্ণ।

শৈবাল একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখে, কাদম্বিনী তাহার শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্টা। শৈবাল অতি মৃদুস্বরে বলিল "আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে কত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আজি এই জন্মের তরে যাইতেছি, একবার বলুন, আপনি আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিলেন। আমার পাপভার একটু লঘু হইবে"। কাদম্বিনীর মুখ হইতে একটী বাক্যও বাহির হইল না; একদিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিল। কাদম্বিনী শৈবালের মাথার কাছে বসিয়াছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, শৈবাল বড় কষ্টে তাহার

মাথাটী শাশুড়ীর পদপ্রান্তে আনিল। কাদম্বিনী চাহিয়া দেখে, শৈবাল কাঁদিতেছে। সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

পাড়ার স্ত্রীলোকেরা শৈবালকে দেখিতে আসিল। বালক বালিকারা সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কোন কোন বালক বালিকার মা তাহাদিগকে পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়া গেল। ওলাউঠার রোগীর নিকট আসিতে দিল না। সুরেন্দ্রের মা সুরেন্দ্রকে কোলে করিয়া আসিয়াছেন। সে মার কোল হইতে শৈবালের কোলে যাইতে চাহিল। শৈবাল অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় চক্ষু বুজিয়া আছে। সুরেন্দ্র তাহাকে ডাকিল "ছৈবাল খুলী"। শৈবাল চক্ষু মেলিয়া চাহিল; চাহিয়া দেখে সুরেন্দ্র—তাহার স্নেহ পুতলী সুরেন্দ্র। এখন কথা কহিবার ক্ষমতা নাই; ইঙ্গিতে সুরেন্দ্রকে কোলে লইতে চাহিল। সুরেন্দ্রের মা তাহাকে রোগীর নিকট যাইতে দিলেন না। আবার শৈবালের চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল। শৈবাল তৃষিত লোচনে সুরেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অন্যান্য বালক বালিকারা শৈবালের পাশে দাঁড়াইয়া। আজি তাহাদের দিকে চাহিয়া শৈবালের বড় দুঃখ। আজি শৈবাল তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে। আজি তাহার চক্ষু জলের বিরাম নাই। বালক বালিকারাও শৈবালের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গ্রামে একটী গণ্ডমূর্খ ডাক্তার ছিল। সে ওলাউঠা রোগের অনেক ঔষধ ব্যবস্থা করিল। শৈবালের মোহ ভাঙ্গিল না। বেলাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, শৈবালের শিরা লোপ পাইয়াছে। শৈবাল মরিয়াছে। কয়েক জন লোক ধরাধরি করিয়া, শৈবালকে ঘর হইতে বাহির করিল। কাদম্বিনী শাল্মলী তরু ইব মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিল। আজি

কাদম্বিনীর রোদন স্বরে সমস্ত বাড়ী, সমস্ত গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আহাহা! আজি তাহার কত দুঃখ। স্ত্রীলোকেরা কাদম্বিনীকে কত সান্ত্বনা করিতেছে, কত প্রবোধ বাক্য বলিতেছে। কাদম্বিনী কেবল কাঁদিতেছে; কেবল বিলাপোক্তিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। আজি তাহার আর্ত্তস্বর কিছুতেই থামিতে চায় না। আজি পিতামহী ঠাকুরাণী এক ধারে একবারে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া। পড়িয়া পড়িয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে তাঁহার বংশের যে সমস্ত লোক মরিয়াছে, তাহাদের নাম করিয়া কাঁদিতেছেন; আর মাঝে মাঝে গোপনে চাহিয়া দেখিতে-ছেন, লোক জন চলিয়া গিয়াছে কি না। আজি তাঁহারও কান্না কিছুতেই থামিতেছে না।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গ্রামের লোক জন আসিয়া, ভুবনমোহন রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত। শৈবালকে সংকারার্থে সকলে শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া গেল। ভূতের পুকুরপাড় পাঠক পাঠিকাদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কাদম্বিনী সেই রাত্রি কিছু আহার করিল না।

বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে, অনেকেই একটু একটু অহিফেন অভ্যাস করিতে বাধ্য হন। ভুবনমোহন রায়ও এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন নাই। পর দিবস অহিফেনের কোটা খুলিয়া দেখেন, কয়েক গুলি অহিফেন চুরি গিয়াছে। শৈবাল অহিফেন খাইয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী কতক দিন ধরিয়া শৈবালের জন্য খুব কাঁদিল। পাড়ার লোকে বলিত "বউটা এত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়াছে, তবু তাহার জন্য দিবা

রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন।” লোক দেখিলে কাদম্বিনীর কান্না আরও বাড়িত।

শৈবাল মরিয়াছে, অতুল গৃহত্যাগ করিয়াছে, কাদম্বিনী এখন নিষ্কণ্টক। ভোলানাথ বাবু আবার ভুবনমোহন রায়ের বাড়ী আসিয়া, ডেরা ডাণ্ডা ফেলিলেন।

পাপকার্য্য অনেক দিন গোপন রহিল না। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সন্দেহ করিল, কাদম্বিনীর স্বভাব কলুষিত হইয়াছে। ক্রমে একের মুখ হইতে অন্যের মুখে, অন্যের মুখ হইতে অন্যের মুখে এ সংবাদ নীত হইল। ডাক ঘরের আড্ডায় এখন ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেখানে এখন এই বিষয়ের কত টীকা টিপ্পনি হইতে লাগিল। গ্রামের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, কাদম্বিনী ভ্রষ্টা। স্ত্রীর কলুষিত চরিত্র সমস্ত জগতে রাষ্ট্র হউক; লোকে ইহা লইয়া দিবা রাত্রি আলোচনা করুক; কিন্তু হতভাগা স্বামীকে সচরাচরই এই বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে দেখা যায়। হতভাগা বিবেচনা করে, তাহার স্ত্রী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে; এই ভাল বাসাতে অসচ্চরিত্রতা সম্ভবে না। এইরূপ বিশ্বাস জগতে না থাকিলে, কত হতভাগাকে যে, সংসারে বীতস্পৃহ হইতে হইত, কত হত ভাগিনীকে যে, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত, তাহার সীমা থাকিত না।

সকলে বুঝিল কাদম্বিনী অসতী, কাদম্বিনী ভোলানাথের উপপত্নী। কিন্তু ভুবন মোহন রায় এখনও ইহা জানিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহার বিশ্বাস, কাদম্বিনী তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে। এখনও তাঁহার বিশ্বাস, কাদম্বিনী যাহা করে তাহা দেব কার্য্য, যাহা বলে তাহা দেব বাক্য।

এত দিনে ঈশ্বর অতুলচন্দ্রের প্রার্থনা শুনিলেন। ভুবন মোহন

রায়ের গৃহে থাকিয়া, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, বিশ্বাস ঘাতক, পাপ পুরুষ ভোলানাথ যে, কি পাপ কার্য্য সাধন করিতে ছিলেন, ধর্ম্মের চক্ষে তাহা আর সহ্য হইল না। কাদম্বিনীর চরিত্র সম্বন্ধে ভুবন মোহন রায়েরও কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল। নিরীহ বৃদ্ধ সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি অনুসন্ধানে রহিলেন। অবশেষে দেখিয়া শুনিয়া, অবিশ্বাসও স্থাপন করিতে পারিলেন না। কাদম্বিনীকে ডাকিয়া, একটু ক্রোধভরে বলিলেন, "কাদম্বিনী, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। বল, গুরু মহাশয়ের সহিত কি আলাপ করিয়াছ?" কাদম্বিনীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল "তুমি কখন দেখিলে, আমি গুরু মহাশয়ের সহিত কি আলাপ করিয়াছি?"

ভুব। আমি সকল দেখিয়াছি হতভাগিনী, এখনও তাহা ঢাকিতে চাহিতেছ? এই তোমার সতীত্ব।

কাদ। ওমা! এমন কথাত কোথাও শুনি নাই। এমন স্বামীত কোথাও দেখি নাই। স্বামী হইয়া স্ত্রীর প্রতি এই দোষারোপ। ঠাকুর! তুমি সকল দেখিতেছ, তুমি ইহার বিচার কর।

কাদম্বিনী একেবারে একটানে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল "আমি এখনই গলায় দড়ী দিয়া মরিব। বিষ খাইয়া মরিব। এমন স্বামীর আর মুখও দেখিব না।" শুনিয়া ভুবনমোহন রায়ের একটু ভয় হইল। পাছে কাদম্বিনী আত্মহত্যা করে। কাদম্বিনীর চক্ষুজল তাহার ক্রোধ বহ্নি অনেক নির্ব্বাণ করিল।

সতী, সাধ্বী কাদম্বিনীর পবিত্র হৃদয়ে এই অপবাদ, এই বৃথা তিরস্কার সহ্য হইল না। তাহার ক্রন্দন ধ্বনি বাড়িয়া বাড়িয়া, পাড়াকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। রায় মহাশয় নিতান্ত নিরুপায়ে পড়িলেন। তিনি উপসংহার কালে বলিলেন "তুমি এখন পর্য্যন্ত অল্প বয়স্কা। এক

জন ভিন্ন পুরুষের সহিত এরূপ আলাপ ভাল দেখায় না। লোকে দেখিলে মনে কি ভাবিবে ?” কাদম্বিনীর দুঃখ কিছুতেই কমিল না।

সেই দিন আর কাদম্বিনী রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল না। ভুবনমোহন রায় পিতৃ স্বর্গার্থে সেই দিন উপবাস করিলেন।

ভোলানাথ ঠাকুরকে আবার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইল। কাদম্বিনী ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, বরং স্বামীর সহানুভূতি করিল।

ভোলানাথের গোপন পত্র কাদম্বিনীর নিকট আসিতে লাগিল। এক দিন একখানা চিঠি ভুবন মোহন রায়ের হস্তগত হইল। এইবার তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি কাদম্বিনীকে ক্রোধভরে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কাদম্বিনীর অনুপম রূপরাশি তাঁহাকে প্রহার করিতে দিল না। আজি কাদম্বিনী তত কাঁদিল না, কিছু বলিল না; সমস্ত দিন শয্যাশায়িনী হইয়া রহিল।

পরদিন রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল, কাদম্বিনী গৃহে নাই। অলঙ্কারও নগদ কতকগুলি টাকা লইয়া, কাদম্বিনী পলায়ন করিয়াছে। অনুসন্ধানে জানাগেল, ভোলানাথ বাবুও মতিগঞ্জ ছাড়িয়াছেন।

পাঠশালার বালকেরা এ সংবাদে বড় সুখী হইল। তাহারা যেন কোন দানবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহাদের এখন লগুড়-হস্তপীড়নের ভয় নাই।

পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পুলিশ আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল। কাদম্বিনীও ভোলানাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

এই সংসারে শিক্ষা দুই প্রকার। এক ইচ্ছা পূর্ব্বক শিক্ষা, অন্য অনিচ্ছা পূর্ব্বক ঠেকিয়া শিক্ষা। ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকে ভূগোল শিখে, গণিত শিখে, সাহিত্য শিখে, বিজ্ঞান শিখে, কত কি শিখে। তাহাতে

লোকের বাহ্য জগতের কতকগুলি জ্ঞান জন্মে। কষ্টে পড়িয়া লোক অভিজ্ঞতা শিক্ষা করে। কষ্টে না পড়িলে লোকের সংসারে জ্ঞান জন্মে না, লোকের বহুদর্শিতা লাভ হয়না? ভুবন মোহন রায় আজি ঠেকিয়া শিখিলেন। আজি তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, অতুলের নামে কাদম্বিনী যাহা কিছু বলিয়াছে,তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। না বুঝিয়া, না-শুনিয়া কেন অতুলচন্দ্রকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। অতুলের জন্য তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আজি তিনি বুঝিলেন, না-জানিয়া, না পরীক্ষা করিয়া, কোন কার্য্যেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। শৈবালের কথা মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয় মধ্যে আগুণ জ্বলিতে লাগিল। তিনি জানিয়াছিলেন, শৈবাল বিষ পান করিয়াছে। কিন্তু পিশাচিনী কাদম্বিনী এরূপ মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে যেই পথে যাইতে বলিল, শিশুর ন্যায় তিনি সেই পথই অবলম্বন করিলেন। ভুবন মোহন রায়ের হৃদয়ে এখন মহা আত্মগ্লানি। যাহারা তাঁহাকে বিবাহের পরামর্শ দিয়াছিল, তাহাদের প্রতি বড় অশ্রদ্ধা জন্মিল। সংসারে তাঁহার বড় বৈরাগ্য জন্মিল।

তিনি অতুল চন্দ্রের কত অনুসন্ধান করিলেন। কোথাও তাহার সংবাদ পাইলেন না। আজি অতুলকে দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড় কাতর। আজি অতুলকে পাইলে, তাহাকে বুকে চাপিয়া রাখিতেন; আর তাহাকে বুকে রাখিয়া, অশ্রুজলে তাহার নিকট মাপ চাহিতেন। অতুল কোথায়? অনেক অনুসন্ধানেও তাহার সন্ধান পাওয়া গেলনা। ভুবন মোহন রায় শৈবালের মৃত্যু ভাবিয়া, অতুলের নির্ব্বাসন ভাবিয়া, আপনার কার্য্য কলাপ ভাবিয়া, একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অতুলের বৈষয়িক অবস্থা অনেক ফিরিয়াছে। সে এখন কান্তি বাবুর ইষ্টেটের ম্যানেজার। উপযুক্ত পুত্রের হস্তে ম্যানেজারি ভার দিয়া, যেমন অনেক জমীদার নিশ্চিন্ত থাকেন; অতুলের হস্তে সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া, কান্তি বাবুও তদ্রূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। অতুলের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও বিশ্বাস এত।

কান্তি বাবু অতুলের সাংসারিক অবস্থা বিশেষরূপে জানিয়াছেন। তিনি এখন সর্ব্বদা বলেন "বাছা অতুল, বউটীকে এখন লইয়া আইস। আহা! এমন সরল প্রতিমাকে কি আগুণে ফেলিয়া রাখিতে আছে? আমার সংসারে তাহার যত্নের কোন ত্রুটী হইবে না।" সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অতুলের স্বভাব-চাঞ্চল্য অনেক দূর হইয়াছে। কল্পনা রাজ্য দিন দিন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিল। এখন শৈবালের প্রতি তাহার স্নেহ দিন দিনই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। অতুল অবসর মতে মতিগঞ্জে যাইয়া, শৈবালকে লইয়া আসিবে, স্থির করিল। সুরেশ বাবুর সহিত এখন একটী বড় মোকদ্দমা জিলার জজ আদালতে দায়ের। তাহাতে অতুলের সাক্ষ্য ও তাহার দস্তখতী একখানা পাট্টা তজদিকের নিতান্ত আবশ্যক। এই মোকদ্দমার জয় পরাজয়ের উপর উভয় পক্ষেরই ক্ষতি বৃদ্ধি বিশেষরূপে নির্ভর করে। কাযেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ভিন্ন অতুল মতিগঞ্জে যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে অতুল আকাশের কুসুম লইয়া, আপনার কল্পনা উদ্যান সাজাইত; আজি সেইস্থলে পরিবর্ত্তন উপস্থিত। পাঠক চুপি চুপি চাহিয়া

দেখ, অতুলের কল্পনা উদ্যানে আজি শৈবাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈবালকে চিঠী লিখিয়াও অতুল উত্তর পায় নাই। আজি অতুল ভাবিল, শৈবালকে আর চিঠী লিখিবে না; হঠাৎ যাইয়া মতিগঞ্জে উপস্থিত হইবে। হঠাৎ অতুলকে পাইয়া শৈবাল বিস্মিত হইবে। কত দিন দেখে নাই. আজি অতুল কল্পনা বলে দেখিল, শৈবাল যেন শান্ত হইতেও শান্ত হইয়াছে, সরল মুখের গাম্ভীর্য্য যেন গম্ভীরতর হইয়াছে। কাদম্বিনীর বিবদাহনে শৈবাল দগ্ধ হইতেছিল। আজি অতুল কল্পনা চক্ষে দেখে, তাহাকে দেখিবামাত্র শৈবালের সে বিষাদ চিহ্ন দূরীভূত হইয়া, হর্ষের জ্যোতি যেন তাহার চোক্ মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। শৈবাল আত্মহারা হইয়া আসিয়া যেন তাহার বুকে পড়িল। অতুল সেই স্নেহাপ্লুত মুখ খানি তুলিয়া, তাহাতে চুম্বন করিল; শৈবাল তাহার বুকে মাথা লুকাইয়া যেন মরিয়া গেল। আজি অতুলের কল্পনা শৈবালের চিত্রে সজ্জিত। আজি সে ভাবিল শৈবাল তাহার, সে শৈবালের। এরূপ ভাবে শৈবালকে লইয়াই অতুল এখন তাহার সুখ কল্পনায় রত। তবে একবার পাঠক, অতুলকে ক্ষমা কর।

একদিন কাছারীর কার্য্য শেষ করিয়া, অতুল এক ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ডাক্ পিয়ন আসিয়া, কতকগুলি চিঠী ও খবরের কাগজ দিল। চিঠীগুলি জিলার মোক্তার লিখিয়াছেন; তাহাতে মোকদ্দমা সংক্রান্ত কথা লিখিত ছিল। অতুল সে সমস্ত চিঠী পড়িয়া, চিঠীর মর্ম্মানুসারে যাহা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল। পরে কাছারীর কার্য্য শেষ করিয়া, একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িল। ইংরাজী কাগজ খানা পড়িয়া, একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক কাগজ পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে এক স্থানে একটী সংবাদ পড়িয়া. কাগজ খানা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। অতুল বজ্রাহতের ন্যায়

একবারে বসিয়া পড়িল। সংবাদে লিখিত ছিল "অদ্য কয়দিন হইল মতিগঞ্জ গ্রামে ভুবনমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অতুলচন্দ্র রায়ের স্ত্রী শৈবালিনী অতি সন্দেহ জনক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পুলিশ খবর পাইয়াছে. অহিফেন সেবনে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গ্রামে রাষ্ট্র ওলাউটা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আজি কে বুঝিবে অতুলের হৃদয়ে কি আঘাত? শৈবালের কথা মনে করিয়া, শৈবালের ভালবাসা, শৈবালের সরলতা, মনে করিয়া, অতুলচন্দ্রের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আসিবার সময় একবার শৈবালকে দেখিয়া আসে নাই। আর সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শৈবালকে এ জগতে দেখিবে না। এত দিনে শৈবাল রত্নের অভাব অতুলের হৃদয়ঙ্গম হইল। শৈবালের বিরহে সে আজি ঘোর উন্মত্ত। আজি হৃদয় পীড়িত স্বরে শৈবালকে ডাকিল। যে শৈবাল অতুলের সম্বোধনে কখনও নিরুত্তর থাকিতে পারে নাই; যে শৈবাল, অতুল "শৈবাল" বলিয়া ডাকিলে, একবারে গলিয়া যাইত; আপন সুখের সীমা করিতে পারিত না; আজি সে শৈবাল সংসারে নাই। অতুলের কথায় অতুলের সম্বোধনে সে আজি নিরুত্তর। আজি অতুল গভীর হৃদয় বেদনায় বলিল "শৈবাল! এই হত-ভাগা কোন দিন হাসিয়া তোমাকে ডাকে নাই। এই হতভাগা তোমার ন্যায় রত্নের আদর করে নাই। এ সংসারে দগ্ধ হইবার জন্য আসিয়া-ছিলে, দগ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে!" অতুল স্বর্গের দিকে চাহিয়া বলিল "শৈবাল! আজি তুমি স্বর্গে, আমি মর্ত্ত্যে। কিছুদিন পরে অনন্ত নরকে যাইব। আর তোমার নিকট আসিতে পারিব না। শৈবাল, আমাকে রক্ষা কর।" অতুল বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিল। মুখে শব্দ নাই, হৃদয়ে মহা শ্মশান। অতুল তাহাতে দগ্ধ হইতে লাগিল।

কান্তি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী অতুলকে স্নেহস্বরে কত সান্ত্বনা করিতেছেন। এ আগুণ কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইতেছে না। সোনার প্রতিমা কুমুদ অতুলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া; অতুলকে কাঁদিতে দেখিয়া, সেও কাঁদিল।

শৈবালের জন্য অতুল বড় কাতর হইয়া পড়িল। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সকলই কমিয়া আসিল। সতীশ প্রতিদিন আসিয়া অতুলকে সান্ত্বনা করিত। যুবকের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সতীশ আসিল; আসিয়া অতুলচন্দ্রকে উদ্যানে লইয়া গেল।

উদ্যানটী গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত। কান্তি বাবুর পিতা অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই উদ্যান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণী পুষ্করিণীর জলে, তীরে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড শোভিত। অত্যল্প সলিলে নিমজ্জিত প্রস্তর সমূহের আড়ালে থাকিয়া, লালবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ মাছগুলি ক্ষণেক বাহির হইতেছে, ক্ষণেক ভাসমান হইয়া, মুখে বুদ্বুদ নিঃসারণে দর্শকদিগকে মুখ ভঙ্গিমা দেখাইতেছে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র কৃত্রিম দ্বীপ। দ্বীপের মধ্যভাগে একটী ফোয়ারা। ফোয়ারার উপরে একটী কৃত্রিম পাখী নির্ম্মিত। পাখীর মুখ হইতে জলোৎস রৌপ্যছটায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দ্বীপের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী চারা গাছ; জলে তাহাদের সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে। মাছগুলি কখন কখন সেই ছায়ায় যাইয়া বিশ্রাম লইতেছে। পুষ্করিণীর চারিদিকে গোলাকৃতি একটী পথ। এই পথ হইতে চারিদিকে চারিটী পথ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দিক লক্ষ্যে বাহির হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর মণ্ডিত ক্ষেত্রে টবে টবে ফুলের গাছ সকল সাজান। কোথাও বৃক্ষ-কোলে গোলাপ সুন্দরী ফুটিয়া আছে।

একটী দুষ্ট লতিকা বৃক্ষকে জড়াইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া, মাথা তুলিয়া, তাহার সুন্দর মুখখানা দেখিতেছে; আর সোহাগে একটু দুলিতেছে। এ স্থানটীর উপরিভাগে লৌহ তার নির্ম্মিত গৃহ। গৃহোপরি লতাবলী। অতি প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ও সূর্য্যদেব এখানে হীনপ্রভ।

অনতিদূরে কয়েকটী অত্যোচ্চ ঝাউ গাছ। উদ্যানপালের কৌশলতা নিবন্ধন উহাদের দেহ এরূপ গঠিত হইয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে সারি সারি মঠশ্রেণী বলিয়া ভ্রম হয়। ঝাউ গাছের প্রান্তভাগে একটী দুর্ব্বাদল ক্ষেত্র, হরিত মখমলে মণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ক্ষেত্রের চারিদিকে আম, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি নানা জাতীয় অত্যোচ্চ বৃক্ষ সকল কৌশলক্রমে রোপিত। এই ক্ষেত্রের উপরিভাগে কোন আচ্ছাদন নাই; নীলিম আকাশই ইহার আচ্ছাদনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। দুর্ব্বাদল ক্ষেত্রের চারি প্রান্তে কতগুলা লৌহ নির্ম্মিত আসন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সতীশ অতুলচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া একখানি আসনে আসিয়া উপবেশন করিল। অতুলের মন চিন্তামগ্ন। তাহার মুখ বিষণ্ণ। সতীশ স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কতদিন আর চিন্তা করিয়া মনের অসুখ বৃদ্ধি করিবে? তুমি যে নিত্য নিত্য শুকাইতে লাগিলে।"

অতুল। সতীশ, চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই হৃদয়ে আর শান্তি স্থাপন করিতে পারি না। আমি নিজের কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম। হতভাগিনী শৈবাল দুঃখ লইয়া জগতে আসিয়াছিল, দুঃখরাশি লইয়াই চলিয়া গেল। আমি জানিতাম, শৈবাল আমাকে ভিন্ন কিছু জানিত না। কিন্তু আমি এত কর্কশ, এত কঠিন হৃদয় যে, কখন তাহার সহিত হাসিয়া কথাটী বলি নাই। তাহার ভালবাসার প্রতিদান

কিছু করি নাই। আমি পশু, সে পবিত্র রত্নের মূল্য বুঝিতে পারি নাই। আমি জানিতাম এই কষ্ট তাহার জীবনের শেষ করিবে। তবু আসিবার কালীন সেই পবিত্র মূর্ত্তি একবার দেখিয়া আসিলাম না। হৃদয়ে যে, অনুতাপ বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার আর নির্ব্বাণ নাই। ইহা চিরকাল আমাকে দগ্ধ করিবে।

সতীশ। অতুল, এই সংসারে সুখ দুঃখ কিছুতেই উন্মত্ত হইতে নাই। উভয়েই আত্ম নাশ। সংসারের সুখে উন্মত্ত হও, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যাইবে। দুঃখে উন্মত্ত হও, হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও বল থাকিবে না। সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, সংসারই এইরূপ ভাবে চলিয়াছে। এই সংসারে কেহই সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে না। সংসারে অমিশ্রিত সুখ বিরল। সংসারে সুখ দুঃখ পরস্পর মিশ্রিত রহিয়াছে। যাহার হৃদয় সেই পবিত্র সুখের জন্য লালায়িত, সে সংসারের সুখ দুঃখের জন্য বড় কাতর নয়। পবিত্র সুখাশী সংসার সুখের প্রতি দৃষ্টি করে না। তাহার দৃষ্টি সেই অনন্ত কালের প্রতি। তাই বলিয়া, আমরা সংসার ভুলিয়া যে কেবল পরকালের চিন্তাই করিব, তাহাও বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া, অনবরত ধর্ম্ম সাধনেই রত, তিনি তাঁহার নিজের হিত সাধন করিতেছেন। যিনি সেই অনন্ত ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া, তাঁহার কার্য্য জ্ঞানে সাংসারিক কার্য্য করেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের হিত সাধন করিলেন; নিজেরও হিতসাধন করিলেন। এই সংসারে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক। গত বিষয় ভুলিয়া যাও, কর্ত্তব্য সাধনে রত হও। তোমার সম্মুখে রাশি রাশি সুখ বিস্তৃত রহিয়াছে। কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে পাপ। এখন চিন্তা ত্যাগ কর, হৃদয়ের বেগ প্রশমিত হউক। ভগবান বশিষ্ট বলিয়াছেন—

"চিন্তনে নৈধতে চিন্তা, স্বিন্ধনেনৈব পাবকঃ।
নশ্যত্য চিন্তনে নৈব, বিনেন্ধনমিবানলঃ॥

অর্থাৎ যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে বহ্নি উদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ চিন্তা দ্বারাই চিন্তা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেরূপ চিন্তার অভাবেও চিন্তা নাশ পায়। ভাই, চিন্তা বাড়াইলেই বাড়ে।

অতুল। সতীশ, ভাই, হৃদয়ে যে, আর বল নাই। দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া, কিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে থাকি। বাল্যকাল হইতে দুরাশা হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়াছিলাম; অমানুষী কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হয় নাই। হৃদয় নিরাশায় অধিকার করিয়াছিল। সংসারের প্রকৃত কার্য্যে মনোনিবেশ করি নাই। আজি তাহার ফল অনুতাপ। আজি তজ্জন্য আমার হৃদয়ে মহা শ্মশান।

সতীশ। হৃদয়ে অমানুষী কল্পনাকে স্থান দিয়াছ, উচ্চ আশাকে স্থান দিয়াছ, তজ্জন্য কোন অপরাধ কর নাই। উচ্চ আশা ভিন্ন মানব জীবনের উন্নতি নাই। কল্পনা ভিন্ন উন্নতি সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না। উচ্চ আশা ও কল্পনা মনুষ্য জীবনের প্রধান অবলম্বন। সেই আশা, সেই কল্পনানুযায়ী চেষ্টা কর, জগতের একজন লোক মধ্যে পরিগণিত হইবে। সেই উচ্চ আশার স্থানে কি একেবারে নিরাশাকে স্থান দেওয়া উচিত? আমি দেখিতেছি তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই, আহারে প্রবৃত্তি নাই। তুমি বাঁচিবে কেমন করিয়া? নিরাশা পীড়িত লোক বাঁচিতে পারে না।

সতীশ একটু ভুল করিল কেন না উচ্চ আশা আর দুরাশা এক নহে। উচ্চ আশা অবস্থোপযোগী না হইলে এবং সীমা অতিক্রম করিলেই তাহা দুরাশা বলিয়া পরিগণিত হয়; তাহার ফল কখনই সুখকর হয় না।

অতুল। গত জীবন মনে করিয়া, আমার হৃদয়ে ভয়ানক আগুণ জ্বলিতেছে। বাল্যকালে পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া ছিলাম। পিতৃ মাতৃ স্নেহ ভোগ করিতে পারি নাই। মার স্থানে খুড়ীমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিধাতার ইচ্ছা আমার জীবনে সুখ হইবে না; তিনিও এই সংসার ত্যাগ করিলেন। আমাদের সংসারে পাপ প্রবেশ করিল। পিতৃব্য আবার বিবাহ করিলেন। যে পিতৃব্য পিতা হইতেও আমাকে অধিক স্নেহ করিতেন, যিনি আমাকে ভিন্ন সংসারে কিছু জানিতেন না, তাঁহার স্নেহ হইতে একবারে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলাম। এ সমস্ত কষ্টও সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কেন বিবাহ করিয়াছিলাম? কেন সেই সরল প্রতিমাকে অতল দুঃখ সলিলে ডুবাইলাম? সতীশ, আমি পাপীষ্ঠ, পশু হইতেও নিকৃষ্ট, শৈবালের মূল্য বুঝিতে পারিলাম না। সেই অমূল্য স্বর্গীয় রত্নে আমার তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। নরকেও আমার স্থান হইবে না।

সতীশ। "ভাই, এ সমস্ত ভাবিয়া কাতর হইও না। এ সমস্ত সংসারের অলঙ্কার। জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, এমন সংসার নাই, এমন গৃহ নাই, যেখানে এই অশান্তি বিরাজ করিতেছে না। নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিও না। গত বিষয় ভাবিয়া আমাদের একেবারে কাতর হওয়া উচিত নয়। লোকের আশা, ভরসা, কল্পনা ভবিষ্যতে বিন্যস্ত। ভবিষ্যতের কোলে রাশি রাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজি যাহাকে ভবিষৎ ভাবিতেছ, কালি তাহা তোমার বর্ত্তমান হইবে। যে বর্ত্তমান জীবনকে কষ্ট দেয়, ভবিষ্যৎ জীবন সুখী করিতে তাহার চেষ্টা নাই। পশ্চাতের দিকে চাহিও না। পশ্চাতে দৃষ্টি করিলে অনেক সময়ে লোককে প্রস্তরবৎ হইয়া থাকিতে হয়। সম্মুখে চাহিয়া দেখ; ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবার

জগতের কার্য্য সাধনে তৎপর হও। হৃদয়ে আশা স্থাপন কর। তুমি যুবক, সংসারে তোমার অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য রহিয়াছে। স্থির চিত্তে এক বার তৎপ্রতি মনোনিবেশ কর"। সতীশ স্নেহভরে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায়, সহোদর ভাইর ন্যায় অতুলচন্দ্রকে কত বুঝাইল। অতুল বসিয়া বসিয়া সমুদয় শুনিল। সতীশের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া, তাহার স্থির প্রশান্ত, স্নেহপূর্ণ মূর্ত্তিটী দেখিয়া, অতুলের দুঃখ অনেক প্রশমিত হইল। সতীশ বসিয়া বসিয়া অতুলকে আরো কত উপদেশ বাক্য বলিল!

রাত্রি হইয়াছে, সতীশ ভিন্ন পথে বাড়ী অভিমুখে চলিল। অতুল চন্দ্রও অন্য পথে গৃহে রওনা হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আলো নাই, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। নক্ষত্র সকল একটী একটী করিয়া আকাশের গায় ফুটিতেছে। পেঁচক ভায়া সমস্ত দিনের পর এখন কোটর হইতে বাহির হইলেন। তাহার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সে জগৎ সংসারের রাজা। উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। আর পাকশাট মারিয়া ডাকিতেছে।

অতুলচন্দ্র বাগান হইতে বাড়ী যাইতেছিল। বাগান ছাড়িয়াই একটী পথ। এই পথটী একটী নির্জ্জন আম্রকাননের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে অন্ধকার আরো গাঢ়। দুই দিকে গাঢ় অন্ধকারময় আম্রবন, পথটী মধ্যদিয়া গ্রামাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। অতুল এইস্থানে প্রবেশ করিয়া শুষ্ক পত্রের মড়্ মড়্ শব্দ শুনিতে পাইল। বন্যপশু

বোধে তাহার মনে একটু ভয় হইল। নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল, পদপীড়ন শব্দ ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাহার ভয় আরও বাড়িল। অতুল সরিয়া একটী বৃক্ষ অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ফুস্ ফুস্ মনুষ্য আলাপ তাহার কর্ণ গোচর হইল। তাহার ভয় অনেক কমিয়াছে; এখনি আসিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইল। অতুল দেখিল, কয়েক জন লোক তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সে জিজ্ঞাসা করিল "কে ও?" আগন্তুক দিগের মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল "চুপ"। এক জন লোক আসিয়া অতুলের মুখ চাপিয়া ধরিল। আর একজন কাপড় দিয়া তাহার মুখ বাঁধিল। আর কয়েকজন লোক অতুলচন্দ্রকে হাতে পায় বাঁধিয়া, তাহার দেহ কাঁধে তুলিয়া লইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইল। একজন লোকের হাতে একটী বন্দুক ছিল; সে তাহা দেখাইয়া বলিল "চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলে, ইহার গুলি তোমার মাথা ভেদ করিবে।" অতুল বুঝিল নিষ্কৃতির চেষ্টা বৃথা, কাযেই চুপ করিয়া রহিল। মনে ভাবিল "একি?"

আক্রমণকারীগণ অতুলকে লইয়া এক প্রান্তরে প্রবেশ করিল। প্রান্তর পার হইয়া আর একটী বন। বনের পর এক গ্রাম। উহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া, প্রচলিত পথে চলিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য মধ্য দিয়া, একটী উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানের মধ্যে একটী সুন্দর গৃহ। তাহার অনতিদূরে দৃঢ় প্রাচীর বিশিষ্ট আরো একটী গৃহ। শেষোক্ত গৃহটী এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহার মধ্য হইতে কেহ চীৎকার করিলেও বাহির হইতে শুনা যায় না। আক্রমণকারীরা অতুলকে লইয়া, সেই গৃহের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠে আলো জ্বলিতেছে। একজন লোক ত্বরিত হস্তে অতুলচন্দ্রের মুখের ও হস্ত পদের বন্ধন খুলিয়া

দিল। অতুল চাহিয়া দেখে, সকলেই তাহার নিকট অপরিচিত। কাহাকেও সে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। উহাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল "এই ঘরে যাহাদিগকে দেখিতেছ, সকলেই দস্যু। আজি তোমার জীবন আমাদের হাতে। ইচ্ছা করিলে তোমার জীবন বাঁচাইতে পারি, ইচ্ছা করিলে ইহা বিনাশ করিতে পারি। আজি আমরা যাহা করিতে বলি, তাহা কর। তোমাকে যে স্থান হইতে ধরিয়া আনিয়াছি, অদ্য রাত্রিতেই পুনরায় তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসিব। আর অসম্মত হইলে, এই যে তরবারি দেখিতেছ, ইহা তোমার হৃদয়-শোণিত পান করিবে। কেহ তাহা জানিবে না, কেহ তাহা শুনিবে না। তোমার মৃতদেহ আমরা এক স্থানে পুতিয়া রাখিব।" অতুল ভীত হইয়া উত্তর করিল "তোমাদের ইচ্ছা কি? তোমরা কি করিতে বল?" অমনি এক ব্যক্তি একখানা লিখিত কাগজ বাহির করিল। বাহির করিয়া বলিল "অন্য কাগজ দিতেছি, ইহাতে যাহা লেখা আছে, অবিকল তাহা লিখিয়া, তোমার নাম সাক্ষর কর।" অতুল কাগজ লইয়া পড়িল। পড়িয়া দেখিল উহাতে যাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহা একখানা তালুকী পাট্টা, কান্তি বাবুর পক্ষ হইতে সুরেশ বাবুর পক্ষের একজন লোককে দেওয়া হইয়াছে। পাট্টা লিখিত ভূসম্পত্তিই দায়েরী মোকদ্দমার বিরোধীয় ভূমি। অতুলের প্রতি কান্তি বাবুর পাট্টা দস্তখতের আমমোক্তারি ছিল; তাহাতেই মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য সুরেশ বাবুর পক্ষে অতুলের দস্তখতী পাট্টার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। অতুল পড়িয়া বলিল "ইহা আমি লিখিব না, ইহাতে আমি স্বাক্ষর করিব না। ইচ্ছা হয় তোমরা আমাকে বধ কর।" এক ব্যক্তি বলিল "মূর্খ, প্রাণের জন্য তোমার ভয় হয় না? ইহা করিলে যে, কেবল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাও তাহা নয়। ইচ্ছা করিলে সুরেশ বাবুর নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থও লাভ হইবে।

অতুল। কান্তি বাবুর মঙ্গলার্থে প্রাণের মায়া আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। তিনি আমার পিতা হইতেও পূজ্যতম। তিনি আমাকে সন্তানাধিক স্নেহ করেন। তোমরা এই ভয় বৃথা দেখাইতেছ। আমি প্রাণের জন্য একটুও ভাবিনা। আমি ইহা করিব না, নিশ্চয়ই করিব না। কান্তি বাবুর মঙ্গলার্থে যদি এই অপদার্থ প্রাণ দিতে হয়, সুখে মরিব। মনে ভাবিব, সৎকার্য্যে জীবন ব্যয় করিয়াছি। তোমাদের অর্থের প্রলোভন আমি পদে দলিত করি।

প্রকোষ্ঠে একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। এক ব্যক্তি ক্রোধ-ভরে তরবারি খানা হাতে লইল। অতুলের দিকে চাহিয়া বলিল "এখন ও সময় আছে, বিবেচনা করিয়া দেখ"।

অতুল। "বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমার দ্বারা এই কার্য্য কখনো হইবে না"। সেই ব্যক্তি খাপ হইতে সজোরে তরবারি বাহির করিল। অতুলের চক্ষে উহা ঝলসিয়া উঠিল। অতুলের প্রাণ কাঁপিল। মরণের জন্য প্রাণ কাঁপিল না; নরকের ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিল। তরবারির গাত্র রক্তাক্ত বলিয়া যেন তাহার নিকট বোধ হইতে লাগিল। যুগপৎ নানা ভাব আসিয়া তাহার হৃদয়ে উপস্থিত। গত জীবনের কার্য্য কলাপ তাহার মনে ভাসমান। সে মনে মনে কান্তিবাবুকে ভাবিল সতীশকে ভাবিল। তাঁহারাই এখন তাহার আত্মীয়, তাঁহারাই এখন তাহার এক মাত্র বন্ধু। স্নেহের প্রতিমা কুমুদিনী আসিয়া তাহার মনে উদয় হইল। অতুলের চক্ষে জল। অতুল আজি বিধাতাকে ডাকিয়া বলিল "বিধাতঃ! মনুষ্য অদৃষ্টে কি তুমি এরূপই লিখিয়া থাক?" ঊর্দ্ধে স্বর্গের দিকে চাহিয়া, শৈবালকে ডাকিয়া বলিল "শৈবাল চাহিয়া দেখ, আজি আমি নরকে যাইতেছি।"

এমন সময় বাহির হইতে কে যেন দ্বারে আঘাত করিল। তরবারি

ধারী দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। কাহার সহিত কি যেন পরামর্শ করিল। আবার গৃহ প্রবেশ করিয়া বলিল "তোমাকে আরো সময় দেওয়া গেল, বিবেচনা করিয়া দেখ"। সকলে গৃহের বাহির হইল। বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। অতুল এখন এই প্রকোষ্ঠে বন্দী।

রাত্রি হইয়াছে, অতুল গৃহে আসিতেছে না। কান্তি বাবু তাহার অনুসন্ধানে সতীশের বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। সতীশ শুনিয়া বড় বিস্মিত হইল। অতুলচন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করা হইল। তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। সতীশ অতুলের জন্য বড় কাতর হইল। তাহার ভয়—অতুল আত্মহত্যা করিয়াছে। কান্তিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অতুলের জন্য বড় দুঃখিত হইলেন। বালিকা কুমুদিনী কাঁদিল।

ভোলানাথ বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অতুল যে তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল; আজীবন তিনি তাহার প্রতিশোধ লইবেন। পাঠক, আপনারা জানেন, ভোলানাথ আসিয়া স্বরেশ বাবুর সহিত যোগ দিয়াছেন এসমস্ত ভোলানাথেরই কার্য্য।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আজি শঙ্কর পুরের একটী উদ্যান গৃহে কয়েকটী পাপের প্রতিমূর্ত্তি বসিয়া মদ্যপানে নিযুক্ত। মদ্যপায়ীদের মধ্যে চারি জন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটী সুন্দরী, যুবতী। মদ্যপানের আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয়, স্ত্রীলোকটী নব শিক্ষিতা। সহজে পান করিতে

পারিতেছে না। কিন্তু পুরুষ বাহাদুরেরা সকলেই টপাটপ গিলিতেছে, সকলেই উৎফুল্ল। একটী স্থূলকায় পুরুষ এক গ্লাস মদ ঢালিয়া, স্ত্রীলোকটীর সম্মুখে ধরিলেন। সে লজ্জাভয়ে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বলিল "কি করিতেছ? তুমি প্রসাদ করিয়া না দিলে বাবু যে, নিতান্ত দুঃখিত হইবেন।" স্ত্রীলোকটী গ্লাস হাতে লইল। একবার মুখের নিকট লইয়া ঘ্রাণ লইল, পান করিতে পারিল না। অবশেষে সকলের অনুরোধ ক্রমে নাক চাপিয়া ধরিয়া, কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে গ্লাসস্থ সুরাদেবীকে উদরসাৎ করিল। সুরা দেবী পেটে থাকিতে চাহিল না। উর্দ্ধে ফিরিয়া উঠিয়া, কতক নাসিকা পথে, কতক মুখদিয়া বাহির হইল। স্ত্রীলোকটীর বড় কষ্ট হইল। পুরুষেরা তাহাঁকে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দিল। তাহা চর্ব্বন করাতে কতক মদ উদরে রাখিতে পারিল।

কতক্ষণ পরে আবার গ্লাসে মদ ঢালা হইল। সকলে পান করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী এবার অল্প কষ্টে পান করিতে পারিল, কারণ তাহার একটু নেশা হইয়াছে। মদের গ্লাস এখন উপর্য্যুপরি চলিয়াছে। স্ত্রীলোকটী আর বসিতে পারিল না, শুইতে চাহিল। স্থূলকায় বাবুটী তাহাকে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া, শুইতে অনুরোধ করিলেন। যুবতী নেশার ঘোরে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। বাবু আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আর কখনও মদ খাও নাই? আচ্ছা, এখন ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইবে," স্ত্রীলোকটী কোন উত্তর করিল না; কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে তাহার মুখ হইতে "ভেউ" করিয়া একটী শব্দ বাহির হইল। দেখিতে দেখিতেই হতভাগিনী বাবুর কোলে বমন করিয়া দিয়াছে। একজন লোক তাহার মস্তকে জল দিল, মুখে জল দিল। বাবুও গাত্রোত্থান করিয়া, বমি

বিমণ্ডিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন।

স্ত্রীলোকটী এখন এক প্রকার অচেতনাবস্থায় শায়িত। বাবু আসিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানে বসিলেন। আবার তাহার সুন্দর মাথাটী আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। বিপুল কেশ রাশি বাবুর কোলে ছড়াইয়া আছে। পাপ স্পর্শেই যেন সুন্দর মুখের সুন্দর চক্ষু দুটী মুদিত হইয়াছে। সেই সুন্দর মুখ খানা দেখিতে দেখিতে ডাকিলেন "কাদম্বিনী একেবারে কাতর হইয়া পড়িলে ?" কাদম্বিনী সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্তর করিল "সুরেশ বাবু, ভোলানাথ কোথায় ?" বাবু বলিলেন "এখানেই আছে। তুমি একবার চক্ষু মেল।" পাশ ফিরিতে কাদম্বিনীর সুন্দর বাহু লতা সুরেশ বাবুর গলায় জড়াইল। পাপী আজি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। আপাদ মস্তক হর্ষোৎফুল্ল হইল ; ভোলানাথকে বলিলেন "ভাই, তোমার বুদ্ধি ধন্য ! তোমার প্রসাদেই আমি কাদম্বিনীর বাহুলতাস্পর্শ রূপ এই পরম সুখ উপভোগ করিলাম। তোমার এই কার্য্যের প্রতিদান আমি কি করিব ? আজি হইতে তুমি আমার হৃদয়ের বন্ধু।"

ভোলানাথের হৃদয়ে আর আহ্লাদ ধরে না। সুরেশ বাবু তাঁহাকে বড় উৎসাহিত করিয়াছেন ; বড় অনুগৃহীত করিয়াছেন। তিনি আর বসিয়া সুরেশ বাবুর এই উৎসাহ বাক্যের উত্তর করিতে পারিলেন না। মদে উন্মত্ত। একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "আজি কাহাকে ভয় করি ? আপনি যখন আমার সহায়, তখন এই পৃথিবীতে আর কাহাকে ভয় করি ? ভুবনমোহন রায় পুলিশে খবর দিয়াছে। আপনি সহায় থাকিলে পুলিশ আমাকে কি করিতে পারে ? পুলিশের কি ক্ষমতা, ভুবন মোহন রায়ের কি ক্ষমতা যে, সুরেশ বাবুর আশ্রয়ধারী ভোলানাথ শর্ম্মার কেশ স্পর্শ করে ?"

সুরেশ। যদি স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তদারকে আসেন, তবু কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। ভাই, টাকার জোরে কি না হয়? এই রত্নের জন্য না হয় যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিব।

কাদম্বিনী সুরেশ বাবুর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। ভোলানাথের বক্তৃতা শুনিয়া সে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। আবার চক্ষু বুজিয়া বলিল "সুরেশ বাবু, জল।" সুরেশ বাবু এক গ্লাস জল লইয়া কাদম্বিনীর মুখের কাছে ধরিলেন। কাদম্বিনী কতক পান করিয়া, আবার তদবস্থায় শুইয়া রহিল।

ভোলানাথ এখন আরো উন্মত্ত। তাঁহার স্বর থাকিয়া থাকিয়া উচ্চে উঠিতেছে। তিনি একবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন পাজী ছেলেটা আমাকে গ্রাম হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ওর বাবাকে চিঠী লিখিয়াছিল। আজি আসিয়া দেখুক্ তাহার খুড়ী কোথায়। আজি আসিয়া দেখুক কাদম্বিনী কাহার কোলে শুইয়া আছে। সুরেশ বাবু, আমরা ইচ্ছা করিলে এখনই উহার জীবন লইতে পারি। এখন পর্য্যন্তও অনুগ্রহ করিয়া জীবিত রাখিয়াছি।" ভোলানাথ যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "কেমন পাজী, আত্মকার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিতেছিস্। একবার দেখ আসিয়া তোর খুড়ীমা কাদম্বিনী আমাদের বাবুর কোলে শুইয়া আছে।"

হঠাৎ অদূরে একটা কিসের শব্দ হইল। দেখিতে দেখিতে সেই হলের এক পার্শ্বের কবাটে বাহির হইতে পদাঘাত হইল। ক্রমে আরো সজোরে পদাঘাত। কাষ্ঠের কবাট এই ক্রোধ-প্রক্ষেপিত দারুণ পদাঘাত সহ্য করিতে পারিল না, ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রোধ প্রদীপ্ত অতুলচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখে সম্মুখে একটা মোটা লাঠি পড়িয়া আছে। উন্মত্ত ভাবে তাহাই হাতে তুলিয়া লইল এবং সজোরে ভোলানাথের

মস্তকে প্রহার করিল। ভোলানাথের মস্তকে রক্তস্রোত দেখা দিল। তিনি "গেলাম রে" বলিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেলেন। সুরেশ বাবু ত্রস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "রাম সিং। রাম সিং কাঁহা হ্যায়?" সিদ্ধির নেশায় রামসিং নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল; কোন উত্তর করিল না। অতুলচন্দ্র সুরেশ বাবুর মস্তকোপরিও এক ঘা প্রয়োগ করিল। দেখিতে দেখিতে সুরেশ বাবুও ভোলানাথের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতুলচন্দ্র আর কি করিল? তাহার ইচ্ছা ছিল, কাদম্বিনীকেও যথাবিধি অভিবাদন করিয়া যায়। পাপীয়সী এখনও নেশার ভোরে ঘুমাইতেছে। অতুলচন্দ্র উন্মত্ত ভাবে বলিল "না।" সে কাদম্বিনীকে প্রহার করিল না, উন্মত্ত ভাবে সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

লস্করপুরে ডাকাডাকি পড়িয়া গেল, গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা আপনাদের ছেলে মেয়েদিগকে ঘরে লইয়া গেল। গ্রামের লোক পুলিশ দেখিলে বড় ভয় পায়; সহজে কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে চাহিল না।

অতুলচন্দ্র যখন সুরেশ বাবু ও ভোলানাথকে প্রহার করিয়া প্রস্থান করে, অন্য মদ্যপায়ী তিনটীও নিরুপায় ভাবিয়া, সেই সময়, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। প্রহরী রাম সিং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিল, গৃহ সম্পূর্ণ নীরব। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে, সুরেশ বাবু ও ভোলানাথ বিছানার উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের মস্তক হইতে অনর্গল ধারায়

রক্ত বাহির হইতেছে। হতভাগিনী কাদম্বিনী এখনও নেশার ভোরে অচেতন; ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। রাম সিং সোজা লোক, সে ভাবিল খুন হইয়াছে। এই কাণ্ড দেখিয়া সে পুলিশে যাইয়া সংবাদ দিল।

সুরেশ বাবু অথবা ভোলানাথ কেহই মরেন নাই। ভোলানাথের মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুরেশ বাবুর হাড় ভাঙ্গে নাই; কিন্তু তিনি গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন।

পুলিশ আসিয়া কাদম্বিনীকে গ্রেপ্তার করিল, রাম সিংকে গ্রেপ্তার করিল, ভজা মালিকে গ্রেপ্তার করিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহারা তাহাকেই গ্রেপ্তার করিল। প্যাদারা ঘরের ছোট খাট জিনিস পত্র গুলি গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। একজন প্যাদার একটী বিলাতী কুকুরের সখ, সে সুরেশবাবুর পোষা কুকুরটীকে গ্রেপ্তার করিল। এই বাড়ীই যেন এখন পুলিশের। ভোলানাথ ও সুরেশ বাবু চিকিৎসার্থে হাঁস্ পাতালে প্রেরিত হইলেন। কাদম্বিনী পুলিশ কাষ্টডীতে রহিল। সে কালের কথা দূরে থাকুক, এখনও গ্রামের পুলিশ অবতার বিশেষ। যাহারা এই কাযের বিন্দু বিসর্গও জানিত না; তাহাদিগকেও দারোগা মহাশয় যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিলেন। পুলিশ সাত আট দিন, লস্করপুরে বসিয়া তদারক করিল।

গ্রামের সাধারণ লোকেরা কেহ মাছ দিয়া, কেহ তরকারী দিয়া, কেহ দুধ দিয়া পুলিশকে অভ্যর্থনা করিল। যাহারা সম্পন্ন, তাহারা অর্থ দানে পুলিশের অন্যায় উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইল।

দারোগা মহাশয় সাক্ষী গ্রহণ মানসে একজন কনেষ্টবল দ্বারা মাধাই ঠাকুরকে, নিমাই সিকদারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মাধাই ঠাকুর, বাড়ীতে পুলিশ আসিতেছে, দেখিয়া একেবারে ব্রাহ্মণীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। নিরুপায় ভাবিয়া, ব্রাহ্মণী তাহাকে ধানের

গোলাতে লুকাইয়া রাখিল। পুলিশ ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বলিল "আমি ঘরে ঢুকিয়া সমুদয় খুঁজিয়া দেখিব।" গরীব মাধাই ইহা শুনিল; সে গোলার মধ্য হইতে উত্তর করিল "প্যাদা সাহেব, আমি এখানেই আছি। সাহেব, আপনি মুসলমান, ঘরে ঢুকিবেন না। দোহাই কোম্পানী বাহাদুরের।"

কনেষ্ট। তবে শীঘ্র বাহির হইয়া আইস।

মাধাই। "এই আমি যাই। তোমার পায় পড়ি বাবা, আমাকে মারিয়া ফেলিও না!"

রাশি রাশি মাকড়শা মস্তকে জড়াইয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধানের খোসা ও ধূলী সংযুক্ত করিয়া, অপূর্ব্ব বেশে মাধাই ঠাকুর ধানের গোলা হইতে বাহির হইল। ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া, তাহার চক্ষু হইতে আবার টশ্ টশ্ জল পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণীর এই দুঃখ সহ্য হইল না, সে একটু সাহসী, মালার থলি হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া কনেষ্টবলের হাতে দিল। কনেষ্টবল বলিল "ঠাকুর, তোমার কোন ভয় নাই। আমার সঙ্গে চল।" মাধাই ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "প্যাদা সাহেব, আপনার হাতে পড়িয়াছি; এখন আপনার কৃপা বাবা।" মাধাই ঠাকুর ও নিতাই সিক্‌দার দারোগা মহাশয়ের নিকটে আনীত হইল। দারোগা মহাশয় মাধাই ঠাকুরের বেশ দেখিয়া,হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে গম্ভীর হইয়া, উভয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধাই ঠাকুর উত্তর করিল "আমার নাম মাধাই ঠাকুর, আমি কেনারাম ঠাকুরের পুত্র, নিধু অধিকারীর পৌত্র, বেচারাম চক্রবর্ত্তীর প্রপৌত্র। এখন ইচ্ছা হয় আমাকে মারেন, ইচ্ছা হয় আমাকে ছাড়িয়া দেন।" নিমাই সিক্‌দার ভয়ে প্রথমতঃ কিছু বলিতে পারিল না। তাহার স্কন্ধ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র পড়িয়া গেল; পরিধানের বস্ত্র খসিয়া পড়িবার উপক্রম

হইল। সে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দারোগা বাবু, আমার নাম নিমাই সিকদার। আমার বাপ নৌকার মাঝিগিরি কায করিত। এখন আমি চাসবাস করিয়া খাই। আমি ছেলে বেলাতে একটী নেবু চুরি করিয়াছিলাম। দারোগা বাবু, ইহা ভিন্ন আমার আর কোন অপরাধ নাই।" দারোগা মহাশয় আবারও কোন মতে হাসি সম্বরণ করিয়া, মাধাই ঠাকুর ও নিমাই সিকদারকে এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। দারোগা মহাশয় তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন

মাধাই ঠাকুর বাড়ী আসিল। আজি তাহার সাহস কে দেখে। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি "দারোগা মহাশয় কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে কি উত্তর দিয়াছে, দারোগার বয়স কত, তাহার কিরূপ চেহারা, তাঁহার কেমন সুন্দর দাড়ি গোঁপ, সে কেমন দারোগা মহাশয়ের খুব নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, একজন প্যাদা কেমন তাহার গায় হাত দিয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, প্যাদাদের কোমরে এক একটা চামড়া বাঁধা, তাহাদের প্রত্যেকের রুল কেমন ওজনে, দারোগা বাবুর সঙ্গে বার জন প্যাদা অসিয়াছে, সকলেরই দাড়ি আছে, তাহারা সকলেই খুব ভাল" ইত্যাদি কত কথা গৃহিণীকে আগ্রহ সহকারে শুনাইল। নেপো-লিয়ান, আলেকজেণ্ডার, হানিবল, প্রভৃতি বীর কেশরীগণ এত দেশ জয় করিয়াও আপনাদিগকে কখন এরূপ বিজয়ী মনে করিতে পারেন নাই। মাধাই ঠাকুর আজি বড় সাহসের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। সে আজি কত বাহাদুর।

একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জানিত না গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে। সে দুধ বেচিতে আসিয়াছিল। যে বাড়ীতে পুলিশের বাসস্থান, সেই বাড়ীতে

প্রবেশ করিয়াই দেখে, লাল পাগড়ী মাথায় কয়েকজন কনেষ্টবল। সে দুধের হাড়ী মাটিতে ফেলিয়া, সত্রাসে এক দৌড় মারিল। বয়স অধিক হইয়াছে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী আসিল। সেই রাত্রিতে তাহার ভয়ানক জ্বর হইল। কিছু দিন পর বৃদ্ধাটীর মৃত্যু হইল।

দারোগা মহাশয় লস্করপুরের পুলিশ লীলা সম্বরণ করিয়া, কতক দিন পর মহকুমাতে চলিয়া গেলেন। সুরেশ বাবুর ক্ষত কিঞ্চিৎ সারিয়াছে। ভোলানাথ ও অনেক সারিয়াছেন। কাদম্বিনী, ভোলানাথ, সুরেশ বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ বিচারালয়ে প্রেরিত হইলেন।

অতুলচন্দ্রের প্রতি সমন বাহির হইয়াছে। কান্তি বাবু অতুল চন্দ্রের জামিন হইলেন।

মোকদ্দমার দিবস উপস্থিত। বিচারালয় নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই হতভাগিনী কাদম্বিনীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র। অতুলচন্দ্রও বিচারালয়ে উপস্থিত। দর্শক মণ্ডলীর এই ব্যবহার দেখিয়া, তাহার দারুণ লজ্জাবোধ হইল।

জজ সাহেব সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, কাদম্বিনীর হৃদয়ে কেমন এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে আজি মুক্ত কণ্ঠে সাহেবের সমক্ষে সমুদয় সত্য বলিল। ভুবনমোহন রায়ের প্রতিও সমন বাহির হইয়াছিল। তিনি দেশে নাই, তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তাহার অনুপস্থিতিতেই অতুলচন্দ্রের ও অন্যান্য গ্রাম বাসীর সাক্ষ্য লইয়া, জজ সাহেব মোকদ্দমার আদেশ বাহির করিলেন। মোকদ্দমার যে কয়টী ইসু হইয়াছিল, তন্মধ্যে অন্যের স্ত্রী ভুলাইয়া বাহির করাও একজনকে অন্যায় পূর্ব্বক কয়েদ করিয়া, তাহার দ্বারা দলিল সম্পাদন করার অভিপ্রায় সম্যক প্রমাণিত হইল।

ভোলানাথের কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর ম্যাদ হইল।

সুরেশ বাবুর তিন বৎসর ও যাহারা অতুলচন্দ্রকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের এক এক বৎসর করিয়া ম্যাদ হইল।

অতুল অব্যাহতি পাইল। কাদম্বিনীর ও আইন বিরুদ্ধ কোন অপরাধ না পাইয়া, বিচারপতি তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কান্তি বাবু অতুলচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিলেন। এখন অতুলচন্দ্র বিপদমুক্ত। কান্তি বাবুর স্ত্রী অতুলকে স্নেহভরে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। কান্তি বাবুও তাহার মঙ্গলার্থে দরিদ্র দিগকে অর্থ দান করিলেন। বাস্তবিক অতুলকে তাঁহারা আপন সন্তানের ন্যায়ই নিঃস্বার্থ স্নেহ করিতেন।

কুমুদের হৃদয়ে আর সুখ ধরে না। সে অতুলের কাছে বসিয়া, বালিকার ন্যায় তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। অতুল একে একে সমুদয় বলিয়া, কুমুদের কৌতূহল নিবারণ করিল। কাদম্বিনীর কথা উল্লেখ করিয়া, কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল "তাঁহার এখন কি দশা হইবে?" স্নেহ পুতুল বালিকা কুমুদের নিকটও অতুলের আজি একটু লজ্জা বোধ হইল। সে বলিল "কুমুদ, পাপীর দণ্ড হইবেই হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী। লোকে হয়ত মানুষকে লুকাইয়া, অনেক পাপ কার্য্য করিতে পারে; তাঁহাকে কেহই কিছু লুকাইতে পারে না। একদিন না একদিন পাপীকে আত্মকার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে।" কুমুদিনী বালিকা। সে বালিকার ন্যায়ই জিজ্ঞাসা করিল "তবে কেন লোকে পাপ কার্য্য করে?"

অতুল। পাপ কার্য্য করে কেন? পাপের এমনি একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, লোকে সেই মোহ সহজে ছাড়িতে পারে না। পাপ কার্য্যে সাময়িক সুখ আছে। সংসারই সুখের জন্য লালায়িত। যে হৃদয় নিতান্ত দুর্ব্বল সে ভবিষ্যতে অন্ধ। সে পরিণাম না ভাবিয়াই, সেই সাময়িক সুখের জন্য উন্মত্ত হয় ও পাপ পথে পদার্পণ করে। পরে তাহার বিষময় পরিণাম ভোগ করে। পাপের পরিণাম যে, এই সংসারেই ভোগ করিতে হইবে, তাহা নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ফুরাইয়া যায়; কিন্তু সেই অনন্ত জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা অনন্ত। সেখানে মৃত্যু নাই, সে জ্বালা যন্ত্রণা আর ফুরাইতে পারে না। পাপের পথ এমনি বাহ্য-সুন্দর, এমন প্রলোভনময় যে মনুষ্য হৃদয় এই প্রবেশ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া, প্রলোভন দেখিয়া, আপন ভুলিয়া যায়। উন্মত্ত হৃদয়ে পাপ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, আর সহজে ফিরিতে পারে না। যাহার জ্ঞান চক্ষু ভবিষ্যতের প্রতি রহিয়াছে, সে এই বাহ্য-সৌন্দর্য্য, এই প্রলোভন বুঝিতে পারে। সে ইহাতে মত্ত হয় না। সে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেও চায় না। কাহারো হৃদয় পাপ কার্য্যে কুণ্ঠিত। কিন্তু আজি যদি সে একটী পাপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে; কালি দ্বিতীয়টী করিতে তাহার হৃদয় তত কুণ্ঠিত হইবে না। কিছুদিন পর শিক্ষাবলে সে ঘোর পাপী হইয়া দাঁড়াইবে। কুমুদ, স্পষ্ট দেখিতেছ, এই হতভাগিনীর এখন কি পরিণাম। ক্রমে ক্রমে পাপে বিচরণ করিয়া, সে এখন পরিণাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। সৎপথে থাকিলে হতভাগিনীকে কোন বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতে হইত না। আজি ইহাকে কে খাইতে দিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহার কত সম্মান, কত আদর ছিল। আজি হতভাগিনী পথের ভিখারিণী, জগতের কলঙ্ক স্বরূপ, লোকের ঘৃণিত পদার্থ। পূর্ব্বে যে সাহস করিয়া ইহার নিকট

কথাটী বলিতে পারিত না, আজি সেও তুচ্ছ করিয়া ইহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ ইহার কি দশা হইয়াছে। মনুষ্য পাপীর পরিণাম দেখিয়াই জ্ঞান শিক্ষা করে।" কুমুদিনী মনোযোগের সহিত এই কথাগুলি শুনিল। কুমুদের হৃদয় বড় কোমল; অন্যের দুঃখে উহা সহজে কাতর হইয়া পড়ে। বাস্তবিকও কুমুদিনী আজি কাদম্বিনীর দশা ভাবিয়া দেখিল। সংসারে সকলের হৃদয় যাহার প্রতি নির্দ্দয়, যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ, করুণ হৃদয় কুমুদের কোমল হৃদয় সেই হতভাগিনী কাদম্বিনীর দুঃখে কাতর হইল। কুমুদ ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে? তুমি কেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলে না? আহা! তাঁহার কি দশা হইবে? কে তাঁহাকে খাইতে দিবে, কোথায়ইবা যাইবেন?"

অতুল। কুমুদ, এই কলঙ্ক আমি কোথায় লইয়া আসিব?

কুমুদ। তুমিই আমাকে উপদেশ দিয়াছ "ঘোর পাপীকেও অবজ্ঞা করিতে নাই।" অতুল কুমুদের কথায় উত্তর করিতে পারিল না।

পাপী দেখিলে মানুষের মনে তিনটী ভাবের উদ্রেক হয়। ক্রোধ, ঘৃণা ও কৃপা। পাপী দেখিয়া যাঁহার ঘৃণা হয়, তাঁহার রাজ্য সাধারণ মনুষ্য জগত হইতে এক বিন্দুও উপরে নয়, এই রাজ্যে মানুষের মহত্ত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পাপী দেখিয়া যাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হয়; তাঁহার আত্মপবিত্রতায় নিজের অটল বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি আপন পবিত্রতার পবিত্র ভাব রক্ষা করিতেই যত্নপর; ঐশ্বরিক ভ্রাতৃ ভাব ভুলিয়া, তিনি নিজরাজ্যেই বাস করিতে ইচ্ছুক; জলমগ্নকে বাঁচাইতে তিনি একপদ জলে নামিতেও ভীত। ইহাতেই বা মানব হৃদয়ের কি মহত্ত্ব আছে? নিজের পবিত্রতায় যদি জগতকে পবিত্র করিতে না পারিলাম, সেই পবিত্রতায়

বল কোথায়? সে পবিত্রতায় নিঃস্বার্থ ভাব কোথায়? কিন্তু পাপীর পাপ দেখিয়া যিনি কাঁদিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হৃদয়বান; তিনিই মানব মহত্ত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি মানুষ হইয়াও দেবতা। দেবতা হইয়াও যেন পাপীর পরিত্রাণার্থে নরকে যাইতে প্রস্তুত। জগতে ইহাপেক্ষা মহত্ত্ব আর কি আছে? জগতে ইহাপেক্ষা ঐশ্বরিক ভাব আর কি আছে? তাহাতেই বলি পাপীকে দেখিয়া ক্রোধ বা ঘৃণা করিও না। পাপীকে দেখিয়া কাঁদিও, সমুদয় পাপী মুক্ত হইয়া যাইবে।

কুমুদের সুন্দর স্বভাব খানি অধ্যয়ন করিয়া, অতুল দেখিল, ইহা বড় সুন্দর। কুমুদ তাহাকে ভুল দেখাইয়াছে, সে কাদম্বিনীকে বড় খুঁজিল; কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিয় পাঠক! যে সংসারে স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, ভালবাসা আছে, সেই সংসারে সুখ আছে, শান্তি আছে, সৌন্দর্য্য আছে। শান্তিময় সংসার স্বর্গের আদর্শ। প্রিয় পাঠক! বিকশিত কুসুম সুশোভিত পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিয়া দেখ; তাহাতে যখন প্রকৃতি সুন্দরী কুসুম দেখিবে, মুকুল দেখিবে; যখন সেই সৌন্দর্য্যময় স্থানে ভ্রমর-গুঞ্জন তোমার কর্ণে অজস্র মধু বর্ষণ করিবে; যখন কুসুম-সৌরভময় মৃদু সমীরণ বহিয়া বহিয়া তোমার অঙ্গ শীতল করিবে; তখন তোমার মুখ হইতে আপনি বাহির হইবে, "আহা! কি শান্তি! কি শোভা!" সেরূপ যদি একবার একটী শান্তিময় সংসারে প্রবেশ কর, আর প্রবেশ

করিয়া যখন সেই সংসারের সুখ দেখিবে, যখন সেই সংসারের স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি দেখিবে; যখন সেই সংসারের আত্মীয়তা, একতা দেখিবে, তখন দেখিবে সেই সংসারের প্রতি হৃদয়ে শান্তি, প্রতি হৃদয়ে সুখ, প্রতি হৃদয়ে ভালবাসা। তখনও তোমার মুখ হইতে আপনি বাহির হইবে "আহা! কি শান্তি! কি সুখ!" শান্তিপূর্ণ সংসার একটী সুখোদ্যান। বালক বালিকা উহার অপরিস্ফুট কোরক ও মুকুল; যুবক যুবতী প্রফুল্ল কুসুম ও সুমিষ্ট ফল; কর্ত্তা, গৃহিনী আশ্রয় বৃক্ষ ও আশ্রয় লতিকা; স্নেহ সম্ভাষণ এই উদ্যানে ভ্রমর-গুঞ্জন। পবিত্রতা এই ক্ষেত্রের সুশীতল মলয় সমীরণ। প্রিয় পাঠক! যদি জগতে থাকিয়া, এই শান্তি উদ্যান সৃষ্টি করিতে চাও; সংসারক্ষেত্রে ভক্তি সরোবর খনন কর; ইহা হইতে স্নেহস্রোত বাহির হইবে। সংসারে স্নেহ বীজ বপন কর; উহা হইতে ভক্তি বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ভালবাসাকে মালি রাখিও; সেই বৃক্ষে শান্তি কুসুম ফুটিবে, শান্তি ফল ফলিবে; উহা স্বর্গীয় শোভায় শোভিত হইবে। যদি দেখ উহার কোন স্থানে দ্বেষের, হিংসার অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে, তাহা তুলিয়া ফেলিও। যদি দেখ সেখানে কুটিলতার চারা বাহির হইতেছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া, সেখানে সরলতা বপন করিও; এই সংসারে স্বর্গ দেখিবে।

কান্তি বাবুর সংসারও এক শান্তি উদ্যান। কুমুদিনী সেই উদ্যানে অপরিস্ফুট কুসুম। এই সংসারে প্রতি হৃদয়ের সহিত প্রতি হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব ভালবাসা বন্ধন। এই সংসারে যে কথাটী স্ফুটিত, তাহাই যেন স্নেহ সঙ্গীত, এই সংসারে যে হাসি বিকসিত হইত, তাহাই যেন হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশ হইতে বিনির্গত। এই গৃহে যে কার্য্যগতি, তাহা যেন সকলই উৎসাহময়। আপন কর্ত্তব্য কাহাকেও কাহার বলিয়া দিতে হইত না। এই সংসারে দাস,দাসীর হৃদয়ে যে সুখ, অন্য সংসারে কর্ত্তা

গৃহিণী সেই সুখভোগী করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই সংসারের কাজলা দাসী মেয়ে মানুষ হইয়াও পুরুষাধিক গর্ব্বে বলিতে পারিত, "কর্ত্তা বাবুর ন্যায় ভাল লোক আর দ্বিতীয় নাই; মা ঠাকুরাণীর মত গৃহিণী আর জন্মে নাই; কোন ঘরেই কুমুদ দিদির মত সুন্দর স্নেহময় মেয়ে নাই।" বাস্তবিক কাজলা দাসী চাকরাণী হইলেও সে সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদ ইঁহাদিগকে দিতে প্রস্তুত। দাস দাসীরা অন্যান্য বাড়ীর দাস দাসীদের সঙ্গে মিলিত হইলে, তাহাদের অন্য কোন কথা ছিল না—অন্য কোন আন্দোলন ছিল না; তাহাদের মুখে যেন ইহা সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছিল যে, "তাহাদের কর্ত্তা বাবুর মত, মা ঠাকুরাণীর মত, কর্ত্তা গৃহিণী আর নিশ্চয়ই নাই, কেহ এই কথার প্রতিবাদ করিলে, দাস দাসীরা তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেও কাতর ছিল না।

এই সংসারে কেবল এক বিন্দু কলহ ছিল। সেই কলহে এক পক্ষ পাগল কুমুদ, অন্য পক্ষ কান্তি বাবুর বৃদ্ধা দাসী "খারুর মা।" খারুর মার বয়স সাড়ে চার কুড়ি পার হইয়া গিয়াছে। মাথায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ সংখ্যক চুল পাকিয়া, সাদা হইয়া, পচিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে—বোধ হয় যেন সাধারণ ঘর্ষণেই সমুদয় উঠিয়া যাইবে। মুখে দাঁতের নামগন্ধও নাই। শরীরের রং কাল; পাকিয়া, শুকাইয়া হাত পা গুলি লোহার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। খারুর মার কখন, কোথায়, কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, স্বামীর নাম কি ছিল, স্বামী এখন জীবিত কি অস্তগত, খারু নামে তাহার কোন সন্তান ছিল কি না, সে সমুদয় সংবাদ খারুর মা নিজেও কিছু জানিত কি না সন্দেহ। খারুর মার বিশেষ পরিচয় আমরা পাঠকদিগকে দিতে পারিলাম না; সকলে তাহাকে খারুর মা বলিয়া ডাকে; আমরাও "খারুর মা" নামেই তাহাকে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম। খারুর মা সম্বব

কি বিধবা, তাহা ঈশ্বর ভিন্ন কেহ জানিত না। কিন্তু সে চিরদিন লালপেড়ে কাপড় পরিয়া আসিতেছে। দন্তবিহীন শুষ্ক পলিত মুখখানা রাত দিন ছেঁচা পানে ভরা থাকিত। কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মত সুবৃহৎ সুগোল সিন্দুরের ফোটা। পাগল কুমুদ ইহা দেখিয়া কেবল হাসিত, আর তামাসা করিয়া খাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি বিধবা হইবে কখন? তুমি কি চিরদিনই এয়ো থাকিবে?" এই তামাসাতে খাকুর মার বড় রাগ হইত। বিধবা হওয়ার কথায় তাহার প্রাণে জল থাকিত না। তাহার সিন্দুরের ফোটার আয়তন আরো বাড়িত। পান ছেঁচার শব্দে বাড়ী আরো শব্দিত ও আন্দোলিত হইত। এই অসহ্য বাক্য শুনিয়া, বুড়ী রাগ করিয়া কুমুদকে "বাঁদর, দুরন্ত" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া, ঠাকুর মার মত গালি দিত। কুমুদ পাগল, সে হাসিতে হাসিতে আবারও তাহাকে সেই হৃদয়ভেদী কথাই বার বার জিজ্ঞাসা করিত। খাকুর মার রাগ আরো বাড়িয়া পড়িত। কুমুদ যখন দেখিত খাকুর মা খুব চটিয়াছে; তখন সে বালিকার ন্যায়, চপলার ন্যায়, পাগলের ন্যায় যাইয়া আপনার সুগোল শ্বেত বাহু দুখানিতে, শকুনিগ্রীব খাকুর মার শকুনি-গ্রীবাখানি জড়াইয়া ধরিত, আর সেই চিরপ্রফুল্ল মুখখানি আরো প্রফুল্ল, আরো উজ্জ্বল করিয়া, খাকুর মার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিত "তুমি আমার উপর রাগ কর কেন? আমি যে তামাসা করি।" স্বামী-সোহাগিনী বৈধব্য-ভীতা খাকুর মার আর কি সাধ্য যে কুমুদকে রাগ করে? অমনি সে কুমুদকে কোলে লইয়া বসিত। তাহার গায়ে হাত বুলাইতে অথবা চুল বাঁধিয়া দিতে থাকিত। কুমুদ এখন শান্ত বালিকার ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, আর মাঝে মাঝে খাকুর মার মুখখানা দেখিয়া চুপি চুপি হাসিত।

কুমুদের আর এক দুষ্টুমি—সে কখনও কখনো খাকুর মার চুলে

বেণী বাঁধিয়া দিতে চাহিত। বুড়া আবার কুমুদকে বাঁদর ইত্যাদি বলিয়া গালি দিত। কিন্তু এবার বুড়ীর তত রাগ হইত না। বিধবা হওয়ার ভয় দেখাইলেই বুড়ীর রাগ। এই সংসারের ইহা ভিন্ন আর কোন কলহ কেহ কোন দিন শোনে নাই। খাকুর মা কুমুদকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাহাতেই কুমুদ মাঝে মাঝে তাহার সহিত এই কলহটুকু না করিয়া থাকিতে পারিত না।

খাকুর মা এত বুড়া যে, কান্তি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে অন্যান্য দাসীর ন্যায় দেখিতেন না। তাহাকে একটু মান্য দৃষ্টিতে দেখিতেন। খাকুর মা কান্তি বাবুকে তুমি বলিয়া ডাকিত। তাঁহার স্ত্রীও খাকুর মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

এই সংসারে আর একটী দৃশ্য বড় মনোহর। সতীশ কান্তি বাবুর স্ত্রীকে মা বলিয়াই ডাকে। তাঁহাকে সে মার মতই ব্যবহার করে। কখনও দেখা যাইত, সতীশ কান্তি বাবুর স্ত্রীর কোলে মাথাটী রাখিয়া, সন্তানের ন্যায়ই তাঁহার পদপ্রান্তে শুইয়া কত আলাপ করিতেছে। কুমুদ হয়ত মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, অন্য পার্শ্বে হেলিয়া তাহা শুনিতেছে। কান্তি বাবুর স্নেহময়ী স্ত্রী সতীশের এই ব্যবহারে একেবারে গলিয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়া অতুলেরও কত দিন ইচ্ছা হইয়াছে, সেও একবার এইরূপে তাঁহার কোলে মাথাটী রাখিয়া, এইরূপ শুইয়া, এইরূপ স্নেহসম্বোধনে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। কান্তি বাবুর স্ত্রী অতুলকেও আপন সন্তানের ন্যায়ই ভাবিতেন। তিনি হয়ত কোন দিন খাইতে বসিয়াছেন; সতীশও বালকের ন্যায় তাঁহার সহিত বসিয়া খাইতেছে। অতুল কতক দিন একটু সঙ্কোচ করিয়া চলিত। কান্তি বাবুর স্ত্রী ইহা দেখিয়া বলিতেন; "বাছা অতুল, তুমি এত সঙ্কোচ করিয়া চল কেন? এই সংসার তুমি আপন বলিয়া ভাবিও। এই স্নেহময়ীর স্নেহ ব্যবহারে

তাহার সঙ্কোচ দূর হইল। ক্রমে সেও এই সংসারের লোক হইয়া দাঁড়াইল। মাতৃহীন অতুলের আবার মা মিলিল।

কান্তি বাবুর সংসার উদ্যান স্বর্গের আদর্শ রূপে সকলকে সুশীতল মলয় সমীরণে স্নিগ্ধ করিতে ছিল। কিন্তু এই সুন্দর উদ্যানে অলক্ষিত ভাবে একটী কীট প্রবেশ করিল। সেই কীট উদ্যান সৌন্দর্য্য অপরিস্ফু কুসুম কোরক কুমুদকে অল্পে অল্পে ম্লান করিতে লাগিল। আস্তে আস্তে, অতি মৃদুগতিতে কুমুদের মনে এক প্রকার চাঞ্চল্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার প্রকৃত স্বরূপ কুমুদ প্রথমে বুঝিতে পারিল না। যখন বুঝিল, নানাভাব আসিয়া সেই সময় তাহার হৃদয়কে যুগপৎ আক্রমণ করিল। সেই ভাবে তাহার হৃদয় দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই কুমুদ অতুলকে অত্যন্ত ভালবাসে; কিন্তু এখন সেই ভালবাসায় কি যেন এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত। সেই পরিবর্ত্তনে ভালবাসাকে আরও গাঢ়, আরও চিত্তাকর্ষণকর করিয়া তুলিয়াছে। কুমুদ বালিকা—চেষ্টা করিয়াও তাহার বেগ প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সতীশকেও ত কুমুদ অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু সেই ভালবাসা, জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি কনিষ্ঠ ভগ্নীর যে ভালবাসা—দেবতার প্রতি ভক্তের যে ভালবাসা। সতীশকে কুমুদ দেবতা বলিয়া জানিত। অন্যরূপ ভালবাসা লইয়া, কুমুদ সতীশের কাছে যাইতে সাহসী হইত না। কুমুদ জানে, তাহার পিতা সতীশের সহিত তাহাকে, বিবাহ দিতে মনন করিয়াছেন। হয়ত সতীশেরও তাহাই ইচ্ছা। ইহা ভাবিয়া, বালিকার মন বড় ক্লিষ্ট হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, পিতার মনে, সতীশের মনে কখনও কষ্ট দিবে না।

কুমুদ আর এখন অতুলচন্দ্রের নিকট তত আসে না। এখন সে

প্রায়ই মার নিকট থাকে। সে যেন অতুলের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে, এখন অতুলকে দেখিলে লজ্জিত হয়। কুমুদের এই ব্যবহার দেখিয়া, অতুল মনে ভাবিল "কুমুদের এই পরিবর্ত্তন কেন? আমি কি তাহাকে কিছু বলিয়াছি? না, কখনওত মনে পড়ে না। তবে কুমুদ আমার নিকট আসে না কেন?" অতুলের হৃদয়ে একটু কষ্ট হইল।

একদিন অতুল এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া, একখানি পুস্তক পড়িতেছিল। না জানিয়া কুমুদ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। অতুল চাহিয়া দেখে কুমুদ। অমনি উঠিয়া সহোদরের ন্যায় কুমুদের হাত ধরিল। কুমুদের ক্ষুদ্র দেহখানি কাঁপিয়া উঠিল; সুগৌর মুখখানি আরক্তিম হইল; মস্তক অবনত করিয়া, কুমুদ দাঁড়াইয়া রহিল। অতুল দুঃখিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এখন আমার নিকট আস না কেন? আমার সহিত আলাপ কর না। এখন আর আমার কাছে পড়িতে আস না। আমি তোমাকে কি কিছু বলিয়াছি? আমি কি তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়াছি?" বালিকার ধৈর্য্য আর রহিল না। অতুল দেখিল কুমুদ কাঁদিতেছে। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাতর স্বরে বলিল "একি! কুমুদ, তুমি কাঁদিতেছ কেন? বল, আমি তোমার মনে কি কষ্ট দিয়াছি? তোমার চক্ষে জল কেন? আমি জানি, তুমি আমাকে ভাইয়ের অপেক্ষা অধিক স্নেহ কর। যদি কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, সেই স্নেহ গুণেই তাহা মাপ করিবে না কি?" কুমুদ আর দাঁড়াইতে পারিল না; দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। কেবল যাইবার কালে অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া গেল "অতুল, আমি দুর্ব্বল, অধীর। আমার দোষ গ্রহণ করিও না।"

অতুলের বুঝিতে বাকী রহিল না। হঠাৎ যেন এক তাড়িত প্রবাহ তাহার শরীর-মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। অতুল যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল,

সেই স্থানেই সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কুমুদ তাহাকে প্রেম চক্ষে দেখিবে। সেও কখন হৃদয়ে সেই ভাব পোষণ করে নাই। তবে আজি অচিন্তিত ভাবে কুমুদের মনের গতি বুঝিতে পারিয়া, তাহার মন আন্দোলিত হইল কেন? ছিন্নতার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল কেন? আজি অতুল হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখে, সেই কল্পনা রাজ্য আসিয়া যেন অতর্কিত ভাবে আবার তাহার সম্মুখে উপস্থিত। অতুল কতক্ষণ নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পর-ক্ষণেই অন্যরূপ চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল।

অতুল মনে মনে বলিল "আমার ন্যায় হতভাগ্য এই সংসারে নাই। কান্তি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে এত স্নেহ করেন; আমার জন্য তাহা-দের মনে অসুখ হইবে। আমার জন্য তাঁহাদের সদিচ্ছা পূর্ণ হইবে না।" সতীশের কথা মনে করিয়া অতুল বলিল "সতীশ আমার হৃদয়ের বন্ধু, আমার উপদেষ্টা, আমার একমাত্র আত্মীয়, আমার গুরু। আমিই সেই সতীশের আশা ভরসা, সুখ শান্তি উচ্ছেদের কারণ হইব? হে ঈশ্বর, এই কি সতীশের অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদান? অতুল আর কি ভাবিল? আর ভাবিল কুমুদিনী। স্নেহের লতিকা, সোনার প্রতিমা কুমুদকে কেন সে দেখিল? কেন কুমুদ তাহাকে ভালবাসিল? কুমুদকেত সে পূর্ব্বেও ভালবাসিত, কিন্তু সে ভালবাসা সহোদর ভাইয়ের ভালবাসা। আজি কুমুদের কথা শুনিয়া কেন তাহার মন বিচলিত হইল? মনে মনে কুমুদকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কুমুদ! কুমুদ! মন ফিরাও, এই নরাধম তোমার পবিত্র প্রেমের অনুপযুক্ত। যে স্ত্রী-হন্তা, সে নরাধম বই কি? সে রমণীর স্বর্গীয় প্রেমে অনধিকারী। সতীশের দিকে চাহিয়া, পিতামাতার দিকে চাহিয়া হৃদয় ফিরাও।" অতুল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল "হে ঈশ্বর! হে অন্তর্যামিন্! হৃদয়ে বল দাও আমাকে চিত্ত সংযমের ক্ষমতা দাও।"

শৈবালের মৃত্যুর পর সংসার সুখের আশায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়া, অতুল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কান্তি বাবু তাহাকে কত সান্ত্বনা বাক্যে সেই সঙ্কল্প হইতে ফিরাইয়াছিলেন। কান্তি বাবুর সংসারের স্নেহ, মমতা, পবিত্রতায় শৈবালের শোক পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে কমিয়া আসিয়াছিল। আজি আবার অতুল কান্তি বাবুর কার্য্য ও গৃহ ত্যাগ করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিল। মনে ভাবিল, তাহাকে না দেখিলে কুমুদের হৃদয় ফিরিয়া যাইবে।

অতুল তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাইবে বলিয়া কান্তি বাবুকে জানাইল। কান্তি বাবু এবার আর তাহার এই সদিচ্ছায় অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তাহার যত দিনের আবশ্যক পূর্ণ বেতনে তাহাকে বিদায় দিলেন। অতুল সকলকে বলিয়া শ্যামপুর ত্যাগ করিল।

অতুলের গৃহত্যাগের সময় কুমুদ তাহাকে বলিল "শীঘ্র যে, তোমার সহিত দেখা হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। একেবারেই হয় কি না তাহাও জানি না। কেন না, আমি জানি তুমি কি জন্য আমা-দিগকে ছাড়িয়া যাইতেছ। যাহা হউক এই হতভাগিনীকে ঘৃণা করিও না; দুর্ব্বল চিত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। মনে করিও না, আমি চিত্ত ফিরাইতে চেষ্টা করি নাই। আরো চেষ্টা করিব। ভরসা করি ঈশ্বর আমার সহায় হইবেন।" অতুল এই কথার উত্তরে কি বলিল? অতুল বলিল "ঈশ্বর উভয়েরই সহায় হউন।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অতুল শ্যামপুর ত্যাগ করিল। এদিকে কান্তি বাবু কুমুদিনীর বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কান্তি বাবুর দ্বিতীয় সন্তান নাই; তিনি কুমুদের বিবাহে যথেষ্ট ব্যয় করিবেন।

অতুল শ্যামপুর ত্যাগ করিয়া, পিতৃব্যের অন্বেষণার্থে যে স্থানে গমন করিল, তাহার প্রত্যেক স্থান হইতেই কান্তি বাবুকে চিঠী লিখিয়াছে। কুমুদের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্য কান্তি বাবু অতুলকে অনেক অনুরোধ করিয়া চিঠী লিখিলেন। অতুল তদুত্তরে অতিশয় দুঃখের সহিত জানাইল যে, অনিবার্য্য কোন কারণে সে কুমুদের বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিবে না। কান্তি বাবু বড় দুঃখিত হইলেন।

বিবাহের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কুমুদিনী দিন দিন বিমর্ষ হইতে লাগিল। তাহার মুখে প্রায় হাসি দেখা যায় না। চিন্তা তাহার এক মাত্র সহচরী। পিতা মাতার নিকট তত যায় না। সোনার প্রতিমা কুমুদ ক্রমশঃ শুকাইতে লাগিল। কান্তি বাবুর স্ত্রী কুমুদের অবস্থা দেখিয়া, চিন্তিতা হইলেন। কুমুদকে কত জিজ্ঞাসা করিলেন, বালিকা তাহার অসুখের কারণ মাকে বলিতে পারিল না। খারুর মা কিছু বুঝে না; কুমুদও আর তাহার সহিত দুষ্টুমি করে না; সে ভাবিল কুমুদ বড় শান্ত হইয়াছে। বড় হইয়াছে বলিয়া, কুমুদের মধ্যে আজি এই শান্ত ভাব। সে কিন্তু বড় সন্তুষ্ট হইল।

কুমুদ মনে মনে স্থির করিল আর কাহাকেও ইহা জানাইবে না; হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সতীশকেই সমুদয় জানাইবে। কিন্তু সতীশের সহিত

নির্জ্জনে কিরূপে দেখা হইবে? কুমুদ সতীশকে গোপনে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। সতীশের মনে এক কৌতুহল উপস্থিত। সে ভাবিল এই পাগল কেন তাহাকে নির্জ্জনে দেখিতে চাহিতেছে? কুমুদ তাহাকে কি বলিবে?

কুমুদ যে দিন সতীশকে তাহার সহিত দেখা করিতে লিখিল, সেই দিনই সতীশ কান্তি বাবুর বাড়ীতে গেল। কান্তি বাবু বাহিরে গিয়াছেন; তাঁহার স্ত্রী কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত; সতীশ আসিয়া কুমুদকে তাহার পড়িবার ঘরে পাইল। সতীশ দেখে কুমুদের মুখ বিমর্ষ—সে বড় শুকাইয়াছে। সতীশ স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল "এ কি কুমুদ, তুমি এত শুকাইয়াছ কেন? তোমার মুখ নিতান্ত বিমর্ষ। একি, তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে?" সতীশ দেখিল কুমুদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; কুমুদ কথা কহিতে পারিতেছে না। ব্যগ্রতার সহিত কুমুদের হাত ধরিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "কুমুদ, কি হইয়াছে, আমাকে বল। কিজন্য তোমার মনে কষ্ট? যদি আমার নিকট বলিলে কোন ক্ষতি না হয় আমাকে বল।" কুমুদ পাগলের ন্যায় একবারে সতীশের পদ প্রান্তে বসিয়া পড়িল। বসিয়া পড়িয়া বলিল "বলিব, বলিবার জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি। আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানি। কোন দিন কোন কথা তোমার নিকট গোপন করি নাই, আজিও করিব না। বিশেষতঃ এখন যাহা বলিব, তাহা বলিতে আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" এই বলিয়া কুমুদ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া রহিল। চুপ করিয়া পুনরায় সতীশের মুখ পানে চাহিয়া, গণ্ডবাহী অশ্রু জল মুছিতে মুছিতে অকম্পিত ও ধীরতা ব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিল "সতীশ, আমাদের বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। কিন্তু যেরূপ নির্ম্মল, পবিত্র, উচ্চ ও প্রেমময় হৃদয় তোমার ন্যায় দেবতার উপযুক্ত;

সেরূপ হৃদয় তোমাকে আমি দিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় দুর্ব্বল, অন্যে অনুরক্ত। এই অনুচিত ভাব মনে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তোমার পত্নী হইতে পারি না। এখন তোমাকে সমুদয় বলিলাম—আমারও হৃদয়ের ভার কতক পরিমাণে লঘু হইল। ভরসা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার চরণ ধ্যান করিয়া, আমার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা কালে দূর করিতে পারিব।" সতীশ ত্রস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "সেই আনুরক্তির পাত্র কে? অতুলচন্দ্র?" কুমুদ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর করিল "হাঁ"। সতীশ কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন কি চিন্তা করিল। তাহার প্রশান্ত বদন যেন এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইল। পবিত্রতা ব্যঞ্জক চক্ষুদ্বয় অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় হইল। ধীরে ধীরে পুনরায় কুমুদের হাত ধরিয়া, অতি স্নেহময় স্বরে বলিল "কুমুদ, ভগিনী, আজি তোমাকে আমি গুটিকতক কথা বলিব। স্থির চিত্তে শোন। যখন তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভালবাস, আমি তোমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করি, তখন আমাদের মধ্যে অন্য সম্বন্ধের প্রয়োজন কি? আমার বিবেচনায় যেখানে ভাই ভগ্নিভাব সেখানে পতি পত্নীভাব স্থাপন করা অন্যায়। তাহাতে পূর্ব্ব সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। আমার নিকট ভাই ভগ্নীর ভাব হইতে অধিকতর মধুর অন্য কিছুই বোধ হয় না। বিশেষতঃ এই কয়েক দিন যাবৎ যতই আমি বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতেছি, ততই যেন বোধ হইতেছে, সংসারাশ্রম আমার প্রকৃত উপযোগী নয়। অনাশক্ত ভাবে ভগবানের সেবাতেই জীবন নিয়োগ করার জন্য আমার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে। তোমার প্রাণে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় আমি এত দিন কোন স্থির সঙ্কল্পে উপনীত হইতে পারি নাই। এখন আমার সঙ্কল্প স্থির হইল। তুমি সুখী হইবে, আমারও বিবেক প্রদর্শিত পথ উন্মুক্ত হইবে। ইহা-

পেক্ষা আমার পক্ষে ,অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আর এক কথা—অতুল আমার প্রাণের বন্ধু, তুমি আমার সহোদরাধিক ভগ্নী। হৃদয়ের একধারে তোমাকে, অন্য ধারে অতুলকে এবং মধ্যভাগে সেই ভগবানকে রাখিয়া, আমার আনন্দের ও শান্তির সীমা থাকিবে না।" এই বলিয়া সতীশ অধিকতর স্নেহে, অধিকতর উত্তেজনার সহিত কুমুদকে বলিল "ভগিনি! এস, পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে একবার দাদা বলিয়া ডাক।" কুমুদ সতীশের অমানুষী উচ্চতা দেখিয়া, তাহার স্নেহপূর্ণ পবিত্র বাক্য শুনিয়া, অতিশয় বিস্মিত হইল। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না ; পরে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলে বলিল "দাদা, তুমি দেবতা।"

সতীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "অতুল কি তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে ?"

কুমুদ। জানিয়াছে। সেই জন্যই সে এই গৃহ ত্যাগ করিয়াছে।

এই বলিয়া যেরূপ ভাবে অতুলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল ; তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের কথা যেরূপে অতুলচন্দ্রের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সমুদয় সতীশকে খুলিয়া বলিল। সতীশ কুমুদের চিবুক ধরিয়া বলিল "কুমুদ, উপযুক্ত পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিয়াছ। আমি শীঘ্রই অতুলের অনুসন্ধানে বাহির হইব।" পরে সতীশ কান্তি বাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সতীশ যথা সময়ে কান্তি বাবুকে সমুদয় জানাইল। শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। সতীশ তাঁহাকে পুনরায় বুঝাইয়া বলিলে, তিনিও বুঝিলেন, সতীশের পরামর্শই উত্তম—তাহার যুক্তি অখণ্ডনীয়। সতীশ কান্তি বাবুর অনুমতি লইয়া, অতুলের অন্বেষণে বাহির হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ



অতুল শ্যামপুর ত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত।" আজি সে দেশ পর্য্যটনে রত। দেশ পর্য্যটন করিয়া অতুল কত কি দেখিতে লাগিল। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, পর্য্যটিত স্থান সমূহের প্রাকৃতিক ও মানবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় বিস্তৃত হইতে লাগিল। নানা বিষয়ে সে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল। দেশ পর্য্যটনে সে বড় শান্তি লাভ করিল।

অতুল কখন অত্যুচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বতোপরি যাইয়া, তাহার শোভা দেখিত। কখন ক্ষুদ্র গিরি-নির্ঝরিণী-তটে বসিয়া, নির্ঝরিণীর কল কল গান শুনিত। এই সমস্ত দেখিয়া, ঈশ্বর প্রেমে তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত। মনে মনে বলিত "মঙ্গলময় ঈশ্বর এই পৃথিবীকে কত সৌন্দর্য্যে, কত শোভায় শোভিত করিয়াছেন।" সে তখন গিরি-চূড়ায় বসিয়া হৃদয় ভরিয়া সেই অনন্তদেবের গুণ গান করিত।

একদিন অতুল এক পার্ব্বত্য প্রদেশের এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়াছে। পর্ব্বত পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মাঠ। মাঠে রাখালেরা মেষ চরাইতেছে, গরু চরাইতেছে, খেলিতেছে। কেহ বা হৃদয় ভরিয়া "শ্যাম তু আওয়ে--" প্রভৃতি গান গাইতেছে। ইহা দেখিয়া অতুলের হৃদয়ে বড় কৌতুহল হইল। অতুল চাহিয়া দেখিল, ইহারা বড় সুখী, ইহারা বড় সরল। ইহাদের অঙ্গে ভাল পরিচ্ছদ নাই, সামান্য আহার ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা কখন—কুটীলতাময়, দুরাশা পরিপূর্ণ, অশান্তির আধার, কুটীল মনুষ্য সহবাস ভোগ করে নাই। ইহারা সে

সমস্ত কু-গুণ অভ্যাস করিতে পারে নাই। ইহারা যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছে সমস্তই প্রকৃতি হইতে। পর্ব্বত বেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রান্তর ইহাদের শিক্ষাস্থল। নিরীহ মেষ শাবক ইহাদের খেলার সহচর। ইহারা নিরীহ। অসৎ লোকের সহবাস ইহাদের হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে নাই। সভ্যতা ইহাদিগকে দুরাশা শিক্ষা দেয় নাই। ইহারা প্রকৃতির ছাত্র, প্রকৃতি হইতে সমস্ত সরল গুণ শিক্ষা করিয়াছে। ইহাদের হৃদয়ের প্রফুল্লতা, ইহাদের সহজ পরিতৃপ্তি দেখিয়া, অতুলচন্দ্র আজি আবার ইহাদিগের সহিত আপন জীবন পরিবর্ত্তন করিতে চাহিল।

অতুল দেশ পর্য্যটন করিয়া আর কি শিখিল? নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, অতুল নানা জাতীয় লোকের সহিত মিশিয়াছে; নানা জাতীয় লোকের চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া, অতুলের সংসার জ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিল। পুস্তক পড়িয়া, ভূগোল পড়িয়া, ইতিহাস পড়িয়া অতুল যাহা শিখিতে পারে নাই, এই দেশ পর্য্যটনে সে তাহা শিক্ষা করিল।

অতুল গয়া, প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, পুষ্কর, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়া, পিতৃব্যের অনেক অনুসন্ধান করিল। কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান হইল না। অবশেষে দেশ প্রত্যাগমনই স্থিরসঙ্কল্প করিয়া, বঙ্গ দেশাভিমুখে রওনা হইল।

সতীশও অতুলের জন্য বাহির হইয়াছে। রাজমহল আসিয়া উভয়ের সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ। আজি সতীশকে পাইয়া—তাহার শান্তি-দাতা হৃদয়ের সখা সতীশকে পাইয়া, অতুলের কত আনন্দ, কত আহ্লাদ। স্নেহভরে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিল। উভয়ের বক্ষে উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

প্রথম দর্শনের উত্তেজনা একটু প্রশমিত হইলে, অতুলচন্দ্র কাঁদি

বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলু। সতীশ সেই প্রশ্নের উত্তর করিয়া, একটু হাসিয়া বলিল 'অতুল, তুমি কুমুদের কথা একবারেই জিজ্ঞাসা করিলেনা; তাহাকে ভুলিয়াছ নাকি?" সতীশ দেখিল অতুল চমকিত হইল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে দুঃখিত স্বরে বলিল "সতীশ, ভাই, আমাকে ক্ষমা করিবে কি?" অতুল আর বলিতে পারিল না; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সতীশ অতুলের কাঁধে হাত রাখিয়া অতি মধুর, অতি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল "ভাই, তুমি কি মনে করিতেছ, আমি তোমার মহত্ব, তোমার আত্ম ত্যাগের ইচ্ছা অনুভব করিতে পারি নাই? নহিলে আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন? কুমুদের প্রতি আমার কি এত স্বার্থপর যে, তোমাকে সে ভালবাসে বলিয়া, কি তোমার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট হইব? ভাই, যদি তুমি আমার হৃদয় দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে, আমি কত সুখী। তোমাতে কুমুদ সুখী, তুমি কুমুদে সুখী, ইহা কি আমার আহ্লাদের কারণ নয়?" অতুল মুহূর্ত্তের তরে সতীশকে অবিশ্বাস করিল। মনে করিল সতীশ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আপনার নিকট আপনি লজ্জিত হইল; সতীশকে বলিল "সতীশ, তুমি কি বলিতেছ?"

সতীশ। "আমি বলিতেছি, কুমুদ আমার প্রাণের ভগ্নী। সে রত্নকে তোমার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

অতুল বলিল "তুমি পাগল, তোমার এই আত্ম নাশে মতি কেন?"

সতীশ। "আত্ম নাশ কিসে ভাই! ভগ্নির অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেখিয়া, বন্ধুকে সুখী করিয়া সুখী হইব, ইহা কি আত্ম নাশ? তবে আত্ম সিদ্ধি কাহাকে বলে? ইহা ছাড়া আরো কারণ রহিয়াছে। এ কারণে কুমুদ আমার ভগ্নী ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।

আয়ো শোন”—এই বলিয়া অতুলের কান্তি বাবুর গৃহ ত্যাগের পর যাহা ঘটিয়ছিল, অতুলকে সমুদয় খুলিয়া বলিল। শুনিয়া অতুল বিস্মিত হইল। সতীশের অমানুষী মহত্বে স্তম্ভিত হইয়া, কিছুকাল নীরব রহিল। পরে বলিল “আমি মনে করিয়াছিলাম কুমুদ বালিকা—বালিকা-সুলভ হৃদয়ের বেগ অধিক কাল থাকিবে না।”

সতীশ। কুমুদ তোমাকে ভুলিতে পারিলে মনে করিতাম, সে বড় চঞ্চল, তাহার ভালবাসা অগভীর, সুতরাং মূল্যহীন। কিন্তু কুমুদ সেই প্রকৃতির বালিকা নয়। আচ্ছা ভাই, সেই যেন তোমাকে ভুলিতে সক্ষম। তাহা হইলেও তুমি কি তাহাকে ভুলিতে পারিতে?

অতুল। “সেই কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কে, যে তোমার ন্যায় দেবতার পরিবর্ত্তে কুমুদ আমাকে হৃদয় দান করিবে? যদি এই আশা হৃদয়ে কোন দিন পোষণ করিতাম, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বাতুল। তবে কুমুদকে কে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে?” বলিতে বলিতে অতুলের রুদ্ধ হৃদয়ের বেগ—যাহা এত দিন সে শুষ্ক কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল—দ্বিগুণ বলে উথলিয়া উঠিল। অতুল আজি ধরা পড়িল। সতীশও ধরাপড়া কয়েদীকে জেলে পূরিতে, ফেরারী আসামী লইয়া শীঘ্রই স্বদেশে রওনা হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অতুলচন্দ্র সতীশকে সঙ্গে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিল। ভুবন মোহন রায়ও দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, অতুলচন্দ্রের অনুসন্ধান-

করিয়াছেন; তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন; কোথাও তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। বিফল মনোরথ হইয়া, আজ কয় দিন হইল দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কে বুঝিবে অতুলচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আজি তাঁহার হৃদয় কত কাতর? তিনি এখন বৃদ্ধ, অতুল তাঁহার সংসার জীবনের একমাত্র ভরসা। পিশাচিনীর পিশাচ মোহে অভিভূত হইয়া, তিনি তাঁহার হৃদয় রত্নকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়াছেন; তাঁহার হৃদয় অনুতাপে পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল। এই হৃদয়-দাহনের পরিমাণ কেহ বুঝিতে পারে না। শৈবালের কথা মনে পড়িলে, তিনি শোকাবেগে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন; তাহার বেগে তিনি মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার হৃদয় এখন অশান্তি পূর্ণ। অতুলচন্দ্রকে দেখিলে; একবার তাহাকে বুকে রাখিলে তাহার অনেক শান্তি।

সতীশ ও অতুলচন্দ্র মতিগঞ্জে আসিয়া পৌছিয়াছে। অতুল সতীশকে লইয়া বাড়ী প্রবেশ করিল। প্রবেশ কালীন তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আজি তাহার মনে কত ভাবের উদয়।

অতুল বাড়ী প্রবেশ করিয়া,একেবারে পিতৃব্যের গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখে, পিতৃব্য এক খানা আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শরীর নিতান্ত শীর্ণ। তিনি যেন মরিতে বসিয়াছেন। পিতৃব্যকে দেখিয়া, অতুলের চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; একেবারে উন্মত্ত ভাবে ভুবনমোহন রায়ের পদ প্রান্তে যাইয়া বসিয়া পড়িল; আর চক্ষু হইতে অবিরল ধারে জল পড়িতে লাগিল। ভুবনমোহন রায় চাহিয়া দেখে, অতুলচন্দ্র। তিনি একেবারে অতুলকে বক্ষে জড়াইয়া [illegible]রে আমাকে ক্ষমা কর; বাবা অতুল, আমাকে ক্ষমা কর,"

বলিতে বলিতে, আতুরের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অতুলও পিতৃব্যের বক্ষে মাথা রাখিয়া, বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। অতুলকে পাইয়া ভুবনমোহন রায়ের শৈবাল-কে মনে পড়িল। তিনি হৃদয়ভেদী মর্ম্ম পীড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন "মাগো শৈবাল, মা সতী সাধ্বী, একবার আসিয়া দেখ, আমার অতুল আসিয়াছে। মাগো, একবার আসিয়া অতুলের সহিত আমার কোলে বস। মাগো, একবার আসিয়া আমাকে ক্ষমা কর। আমিত পুড়িয়া মরিতেছি মা।"

ভুবনমোহন রায় কাঁদিতেছেন, অতুল কাঁদিতেছে, দেখিয়া সতীশও অশ্রু-জল সম্বরণ করিতে পারিল না। সতীশ নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে উভয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

অশ্রুজলে হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা অনেক ধোয়াইয়া লইয়া গিয়াছে। অতুল আবার পিতৃব্যের স্নেহ সাগরে ভাসিতে লাগিল। এই স্নেহ সাগরে যে অশান্তি ঝড় বহিয়াছিল; যে অশান্তি ঝড়ের প্রবল আঘাতে শৈবাল কুসুম অকালে দলিত হইয়াছে; অতুলচন্দ্র দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা আর এখন নাই। এই স্নেহ সাগর এখন প্রশান্ত, নির্ম্মল। তাহাতে এখন মেঘের বিন্দুমাত্রও ছায়া নাই। অতুল আবার সেই স্নেহ মন্দিরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল। অতুল আবার সংসারে সুখ দেখিল। স্নেহের বল এত স্বর্গীয়, এত পরিবর্ত্তক যে, গত জীবন অতুলের নিকট সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইল। তাহার বোধ হইল, আবার যেন সুখময় এক নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে আবার আশা, ভরসার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। মনে ভাবিল হতভাগিনী কাদম্বিনীকে পাইলে বাড়ীতে লইয়া আসিত। উপদেশ দিয়া, তাহাকে সংশোধিত করিত। সে এখন আত্ম কার্য্যের ফল ভোগ করিয়াছে, এখন তাহার হৃদয়

সহজেই সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই হত ভাগিনীকে ঘৃণা করিয়া দূর করিয়া দিলে কি হইবে? বরং যে জীবন সেই অনন্ত কালের জন্য অতল দুঃখে ডুবিয়া রহিয়াছে, এই জীবনেও তাহা অতল দুঃখে ডুবিবে। পাইলে অতুলচন্দ্র আবার কাদম্বিনীকে গৃহে লইয়া আসিত। কিন্তু হতভাগিনী কোথায়? অতুল অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইল না।

সতীশ অনেক দিন অতুলের সহিত মতিগঞ্জে রহিল। আজি যে অতুলের আত্মীয়, অতুলের স্বজন, সে ভুবনমোহন রায়েরও আত্মীয়, স্বজন। ভুবনমোহন রায় সতীশকে যথেষ্ট স্নেহ ও আদর করিলেন।

কিছুদিন পরে উভয়ের হৃদয়ের বেগ প্রশমিত হইলে, সতীশ ভুবন মোহন রায়ের নিকট কুমুদিনীর সহিত অতুলের বিবাহের প্রস্তাব করিল। তিনি শুনিয়া বড় সুখী হইলেন। তিনি সতীশকে কুমুদিনীর রূপ, গুণ সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ তাঁহাকে সমুদয় বলিল। অবশেষ সমুদয় স্থির করিয়া, তিনি কান্তি বাবুকে বিবাহের আয়োজন করিতে লিখিলেন। তিনি নিজেও আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অতুলের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের সমুদয় স্থির। এখন আর কাহারও অসম্মতি নাই। আজি সতীশের কত আনন্দ, কত সুখ। আজি সে কুমুদিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কত সুখী। আজি সে মনে ভাবিল "এতদিনে সোনার প্রতিমা কুমুদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" সতীশ বিবাহের আয়োজনার্থে শ্যামপুর চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ভুবনমোহন রায় আত্মীয় স্বজন সমভিব্যহারে ধুম ধামের সহিত শ্যামপুরে উপস্থিত হইলেন। অতুলচন্দ্রের কুমুদিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ সমাপনান্তে কিছু দিন তাঁহারা শ্যামপুরে অবস্থান করিল। কান্তি বাবু এই কার্য্যোপলক্ষে দীন দুঃখীকে যথেষ্ট দান করিলেন। সতীশ চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত হিতকরী সভায়, সাধারণ পুস্তকালয়ে, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে ও দরিদ্র ভাণ্ডারে যথেষ্ট দান করিয়া, উহাদের উন্নতি সাধন করিলেন।

সতীশ চন্দ্র আহ্লাদ ভরে অতুলকে, কুমুদিনীকে কতিক দিন আপনার বাড়ীতে আনিয়া রাখিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, কুমুদকে ও অতুলকে দুইটি যৌতুক প্রদান করিল।

কিছু দিন পর ভুবন মোহন রায় ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ লইয়া মতিগঞ্জে আসিলেন। তাঁহার সংসারে আবার সুখের প্রবাহ বহিল।

অতুলচন্দ্রকে বিবাহ করিয়া, কুমুদিনী ভাবিল, এই সংসারে তাহার যাহা আশা, যাহা কিছু ইচ্ছা ছিল, সমুদয় পূর্ণ হইয়াছে। এই সংসারে তাহাপেক্ষা সুখী আর কেহ নাই। সংসারে সে আর কিছু চায়না। আজি কুমুদের চক্ষে জগৎ বড় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। আকাশের কোলে পূর্ব্বে চাঁদ উঠিত, তারা ফুটিত; আজি কুমুদ দেখিল আকাশের চাঁদ, আকাশের তারা আরো সুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বে ফুল দেখিয়াছে, আজি আবার তাহা দেখিল। আজি দেখিল, ফুল মুকুল আরো সুন্দর; তাহারাও যেন সুখে হাসিতেছে। কুমুদ চাহিয়া দেখিল প্রকৃতি আমো-

সুন্দর হইয়াছে ; সমগ্র প্রকৃতিই যেন আজি সুখে হাসিতেছে। হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, হৃদয়ে ভক্তি, স্নেহ, দয়া, মায়া যাহা ছিল, সকলেরই বেগ বাড়িয়াছে ; সকলই এখন দ্বিগুণ বলে তাহাকে সংসারে টানিতেছে। অন্তরে বাহিরে কুমুদ সমুদয়ই সুন্দর দেখিতে লাগিল। সকলই আজি তাঁহার নিকট সুখময় বলিয়া বোধ হইল।

আজি আবার ভুবন মোহন রায়ের সংসারে প্রফুল্ল কুসুম কুমুদ শান্তির তরঙ্গ তুলিয়াছে। এই সংসার আবার সুন্দর। যেসমস্ত বালক বালিকা শৈবালের সহচর ও সহচরী ছিল, তাহারা আসিয়া, আবার কুমুদের সহচর ও সহচরী হইল। বালক বালিকাদের এক শৈবাল মরিয়াছে, তাহারা আর এক শৈবাল পাইল। সুরেন্দ্র কুমুদের ও হৃদয় খানি অধিকার করিয়া লইল। হায়! শৈবাল এই বালক বালিকাদিগকে হৃদয়ের সহিত কত যত্ন করিত ; কত ভাল বাসিত। বালক বালিকারা কুমুদেরও নিতান্ত আদরের ধন হইয়া দাঁড়াইল।

অতুল আবার এখন সংসারের লোক। অতুলের কোমল হৃদয় ভালবাসার সরোবর। পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ে যে কুমুদ কোরক অঙ্কিত ছিল ; এই সরোবরে সেই কুমুদ এখন প্রস্ফুটিত কুমুদিনী। এই সরোবরে এখন আর চঞ্চলতা নাই ; কিন্তু অতল স্পর্শ গভীরতা রহিয়াছে। এই সরোবরের জল এখন নিস্তব্ধ। কুমুদ সে সরোবরে ফুটিয়া, আবার তাহাতে তরঙ্গ তুলিল ; সরোবরের জল তরঙ্গায়িত হইল। অতুলের হৃদয়ে প্রতিহত ভাল বাসার স্রোত আবার বহিল; কিন্তু তাহার উন্মত্ততা এখন চলিয়া গিয়াছে। শৈবালের প্রতিমূর্ত্তি অতুলের হৃদয় হইতে অপনীত হইতে পারিল না। ভালবাসার মধ্যে অতুলের হৃদয়ে এই বিষাদ রহিয়া গেল।

সংসারে সুখ দুঃখ কাহারও জন্য চিরস্থায়ী নয়। আজি যাহাকে সুখভারে নিতান্ত উন্মত্ত দেখিতেছ,কালি দেখিবে সে দুঃখভারে আক্রান্ত। তাহার অদৃষ্টে বিপরীত পরিবর্ত্তন উপস্থিত। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সংসারে দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ চলিয়া যাইতেছে। আজি আবার ভুবনমোহন রায়ের সংসারে সুখ হইয়াছে, সৌন্দর্য্য হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা অধিক দিন সুস্থ হৃদয়ে ভোগ করিতে পারিলেন না। কিছু দিন মধ্যে তিনি নিতান্ত পাড়িত হইয়া পড়িলেন। একে বৃদ্ধ, তাহাতে সংসারে বড় জ্বালা যন্ত্রণা, বড়, অশান্তি ভোগ করিয়াছেন; তিনি সহজেই নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

অতুল পিতৃব্যকে ভাল ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইল। কুমুদ নিজ হস্তে তাঁহার সমুদয় শুশ্রূষা করিল। তাঁহার পীড়ার অনেক উপশম হইল; কিন্তু দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারিল না। তিনি দেখিতে দেখিতে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

এই দুর্ব্বলতা কিসের? এখন ভুবনমোহন রায়ের শারীরিক ব্যাধি অনেক সারিয়াছে। তবে তিনি দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন কেন? ঘোর মানসিক অসুস্থতাই, বিষময় অনুতাপই তাঁহার এরূপ দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ।

মনুষ্য জীবন বর্ত্তমান ছাড়িয়া, যতই ভবিষ্যতে অগ্রসর হইতেছে, ততই এই সংসার হইতে জ্বালা যন্ত্রণা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। দুগ্ধ পোষ্য বালক সংসারের কিছুই জানে না। মা তাহার মনোরাজ্যের এক মাত্র লক্ষ্য। ক্রমে বালকের দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনো-রাজ্যেরও সীমা বর্দ্ধিত হইল। বালক ক্রমে সংসার চিনিতে লাগিল। মা ছাড়িয়া পিতা চিনিল। পিতা ছাড়িয়া ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন চিনিল। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশী, দেশবাসী,

অবশেষে মনুষ্য সমাজ চিনিল। বালকের সরল চিত্ত নানা দিকে চলিল। মাতৃ অঙ্ক ছাড়িয়া গৃহ চিনিল, গৃহ ছাড়িয়া বাড়ী চিনিল, বাড়ী ছাড়িয়া ক্রমে দেশ চিনিল। বালক জগত চিনিল, তাহার ইচ্ছার বেগ শতধা বিভক্ত হইল। বালক এখন বাল্যভাব ছাড়িয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়াছে। যৌবনে তাহার দেহ পূর্ণতা পাইয়াছে। মনোবৃত্তি সকল পরিপক্ক হইয়াছে। তাহার সেই সরলতা নাই, তাহার সেই সহজ তৃপ্তি নাই। সে কুটীল সংসার দেখিয়াছে। সে এখন কুটীলতা শিখিল। দুর্দ্দম্য মনোবৃত্তি তাহাকে পাপের পথে লইয়া চলিল। যৌবনে মনুষ্য জীবন পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইল। কতক দিন ভবিষ্যতে অন্ধ থাকিয়া, মনুষ্য পাপ সঞ্চয় করিল। যত দিন বেগ ছিল, তত দিন কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু হায়! সে যৌবনও অধিক দিন রহিল না। জোয়ার গিয়াছে, ভাটা আসিয়া উপস্থিত। ক্রমে যৌবন ছাড়িয়া প্রৌঢ়াবস্থা আসিল, সুখের স্থানে যেন দুঃখ আসিতে লাগিল। প্রৌঢ়াবস্থাও রহিল না; বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত। মনুষ্য দেহ, মনুষ্য মন, মনুষ্য জীবন শিথিল হইয়া আসিল। যৌবনে যাহাতে সুখ, এখন তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, এখন তাহার বিনিময়ে দুঃখ, তাহার বিনিময়ে আত্মগ্লানি। তবে সংসারে কি করিতে আসিলাম? এখন কোথায় চলিয়াছি? জীর্ণ বার্দ্ধক্য আসিয়া এখন সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে। যে বিলাস মোহে পূর্ব্বে সুখের পরিমাণ করিতে পারি নাই, তাহা আর এখন আমার হৃদয়ে সুখ দিতে পারে না। তাহা মনে করিলে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যায় কেন? আমি চলিলাম—সংসার ছাড়িয়া আমি চলিলাম। সংসার ত আমার কিছুই নয়। কিন্তু সংসার হইতে যে পাপ আগুণ ক্রয় করিয়াছি, এই জীর্ণ হৃদয়ে ত তাহা শতগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। গত জীবন ব্যাপিয়া যে সুখে উন্মত্ত ছিলাম, এখন মুহূর্ত্তে

আত্মগ্লানি ত তাহাপেক্ষা শত গুণ—তাহাপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বলবতী। ভুবনমোহন রায়ের গত জীবন এখন তাঁহার সম্মুখে স্পষ্ট-রূপে চিত্রিত। দিন দিন যেন সেই চিত্রপট আরও সুবিস্তৃত, আরও প্রকাশিত। মানস নেত্রে তাহা দেখিতে দেখিতে তিনি ভস্ম হইতে লাগিলেন। সেই জীবন চিত্রে তিনি যৌবনের পাপ দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভস্ম হইতে লাগিলেন। গত বার্দ্ধক্য জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দেখিলেন, তিনি সরল মূর্ত্তি শৈবাল কুসুমকে দগ্ধ করিতে করিতে বিনাশ করিতেছেন। পাপ মূর্ত্তি কাদম্বিনীর সেবা করিতেছেন। তাহার হৃদয়ে দারুণ হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আরও দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি দিন দিন শুকাইতে লাগিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

অতুল পিতৃব্যকে সঙ্গে লইয়া জলপথে মুঙ্গের রওনা হইল। কুমুদও সঙ্গে আসিয়াছে, নদীপার্শ্বস্থ শোভা দেখিয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। নদীতীরে রাখালেরা গাইতে গাইতে গরু চরাইতেছে। স্ত্রীলোকেরা কলসী ভরিয়া নদীর জল শূন্য করিতে যেন একের পর অন্যে জল লইয়া যাইতেছে। কোথাও ছোট ছোট ছেলেরা জলে হাবুডুবু খেলিতেছে। নদী বক্ষে কোন নৌকা দাঁড় বাহিয়া যাইতেছে; কোন নৌকা পালে চলিয়াছে। যে গুলি নিতান্ত অবাধ্য, মাঝিদের কথা শুনে না, মাঝিরা সেগুলি গুণে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কোন কোন নৌকা তীরে লাগাইয়া তাহাতে কেহ পাক করিতেছে,

কেহ শুইয়া আছে, কোথাও বা মস্‌লা পীড়নের ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দ হইতেছে। কোন মাঝি "পাঁচপীড়" বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বালিকা জল পথে কখন কোথাও যায় নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কুমুদের হৃদয়ে কত আহ্লাদ।

দেখিতে দেখিতে অনেক দিন চলিয়া গেল। নৌকা রাজমহলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাজমহলে নদীতীরের শোভা অতি মনোহর। এক প্রশান্ত ধূসরবর্ণের পাহাড় গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া, বোধ হয় যেন গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক নৌকা গণনা করিতেছে; আর দূরস্থ নৌকা সকলকে রাজমহলের অবস্থান বার্ত্তা বলিয়া দিতেছে। গঙ্গা সলিলে তাহার ধূসর বিরাট প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। কোথাও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত প্রস্তর খণ্ডে জল বাধিয়া ভয়ানক শব্দ হইতেছে। সম্মুখে বিষম জলাবর্ত্ত। মাঝিরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সে স্থানে নৌকা বাহিয়া যাইতেছে।

রাজমহল পৌঁছিলে পর মাঝিরা নৌকা ঘাটে বাঁধিল। অতুলচন্দ্র উপরে উঠিয়া রাজমহল দেখিল। একদিন রাজমহল সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। একদিন রাজমহল বিলাসী যবন রাজের বিলাস ভূমি ছিল। আজি তাহা নাই; কালস্রোতে সমুদয় ধোয়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এখন তাহার শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই, পুরাতন চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল কয়েকটী ভগ্নাবশিষ্ট মসজিদ এখনও কালপ্রপীড়িত কলেবরে জীবিত থাকিয়া, মুসলমান রাজধানীর পরিচয় দিতেছে।

এখান হইতে অতুলচন্দ্র পিতৃব্যকে রেলগাড়ীতে মুঙ্গের লইয়া যাইবে। নৌকা এখান হইতে বিদায় দেওয়া হইল। নৌকার কষ্ট দূর করিতে অতুলচন্দ্র পিতৃব্যকে ও কুমুদিনীকে লইয়া, কতক দিন রাজমহলে অবস্থান করিল।

অতুল একদিন পথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থান দেখিতেছে। বাজারের এক প্রান্তে যাইয়া দেখে, কতকগুলি দুষ্ট বালক একটী স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছে; আর আধা হিন্দী, আধা বাঙ্গালা মিশ্রিত এক বিকৃত ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া তামাসা দেখিতেছে। স্ত্রীলোকটীর অঙ্গে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, মস্তকের ধূলি ধূসরিত বিপুল কেশরাশি মুখে, বুকে, পৃষ্ঠে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব শরীর দীর্ঘকাল যাবৎ ধূলি ধূসরিত। সে কখন রুষ্ট হইয়া উঠিতেছে; কখন হাসিতেছে; কখন বালকদিগকে গালি দিতেছে। স্ত্রীলোকটী পাগল।

অতুল দূর হইতে দেখিল, দুষ্ট বালকেরা কেহ তাহার পশ্চাৎ হইতে কাপড় ধরিয়া টানিতেছে; কেহ চুল ধরিয়া টানিতেছে, কেহ ছাই মাটী গায় ছুড়িতেছে; তাহারা তাহাকে বড় কষ্ট দিতেছে। পাগল কখন কাঁদিতেছে, কখন চীৎকার করিতেছে। অতুলের দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। সে বালকদিগকে নিবারণ করিবার জন্য পাগলিনীর নিকটে গেল। বালকেরা অতুলকে দেখিয়া দূরে সরিয়া গেল। অতুল দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বালকেরা কি তোমাকে মারিয়াছে?" পাগলিনী উত্তর করিল "তুই কে রে?"

অতুল। "আমি তোমাকে মারিবার জন্য আসি নাই। তুমি কিছু খাইবে?" পাগলিনী মুখ হইতে রাশি রাশি ধূলি ধূসরিত চুল সরাইয়া, অতুলকে দেখিতে লাগিল। অতুল পাগলিনীর মুখ দেখিয়া, পাগলিনীকে চিনিতে পারিল। তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। অতুল উর্দ্ধে চাহিয়া বলিল "হে বিধাতঃ! পাপীকে ক্ষমা কর।" অতুল ত্বরিত গতিতে যাইয়া পাগলিনীর হাত ধরিল। পাগলিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। এবার পাগলিনী কাতর স্বরে বলিল "আমাকে মারিও না। তোমার পায় পড়ি।"

অতুল। আমি তোমাকে মারিব না। আমি তোমাকে কিছু বলিব না। তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার কোন ভয় নাই।

পাগলিনী। তুমি কে?

অতুল। আমি অতুল।

পাগলিনী।—"তুমি অতুল! অতুল! অ-অ-তুল, গেলাম রে, গেলাম ছাড়িয়া আমাকে ছুঁইওনা, ছুঁইওনা, আমি না, আমি-না, আমি না। হি—হি—হি।" পাগলিনী হাসিয়া পড়িল। অতুল আবার পাগলিনীর হাত ধরিয়া কাঁদিল। অতুল বলিল "না, তুমি আমাকে ভয় করিও না। তুমি আইস, তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে গৃহে লইয়া যাইব।" কাদম্বিনী বলিল "আমাকে গৃহে লইয়া যাইবে? ছি, ছি, ছি, আমাকে গৃহে লইয়া যাইবে। ছি, ছি, ছি, হা-হা-হা।" কাদম্বিনী একেবারে বসিয়া পড়িল। অতুল পরে কাদম্বিনীকে ধরিয়া তুলিল। অতুল বলিয়া কহিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল।

ভুবন মোহন রায় কাতর শরীরে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। কাদম্বিনীকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে?" অতুল তাহাকে সমুদয় বলিল। ক্রোধভরে তিনি একেবারে দাড়াইয়া উঠিলেন। অতুল তাঁহাকে কাদম্বিনীর অবস্থা বলিয়া কতকটা সান্ত্বনা করিল।

কাদম্বিনী এখন ঘোর উন্মাদ। সে কখন হাসিতেছে, কখন কাদিতেছে, কখন আপনা আপনি বকিতেছে। ইহার প্রতি এখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে কি লাভ?

ভুবন মোহন রায় অতুলকে বলিলেন "ইহাকে আবার পূর্ব্ব স্থানে রাখিয়া আইস। ইহাকে আর ঘরে আনিও না।" অতুল বলিল

"আপনি একেবারে অধীর হইবে না। এ পথে পথে এরূপ ভাবে ভ্রমণ করিলে, এ কলঙ্ক কাহার? এ এখন মনুষ্য শ্রেণী হইতে পৃথক। উন্মাদকে ক্রোধ প্রকাশ করিলে কি হইবে?" অতুলের চক্ষে আবার জল আসিল; সে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল "হে ঈশ্বর, পাপীকে ক্ষমা কর।" অতুলের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া, ও কাদম্বিনীর অবস্থা দেখিয়া, ভুবন মোহন রায়েরও ক্রোধ অনেক প্রশমিত হইল। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

অতুল কাদম্বিনীকে একেবারে কুমুদের নিকট লইয়া গেল। যে কাদম্বিনীর কথা শুনিয়া, কুমুদ কাতর হইয়াছিল, তাহাকে আজি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার আরো কষ্ট হইল। কুমুদ স্বহস্তে কাদম্বিনীর গাত্র ধোয়াইতে লাগিল, স্বহস্তে তাহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইতে লাগিল।

কাদম্বিনী একদৃষ্টে কুমুদের মুখ দেখিতেছে। আর যেন মনে মনে কি বলিতেছে। একবার দেখিতে দেখিতে হাসিয়া উঠিল। আবার নীরব হইয়া, কুমুদের পরম সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল। এবার কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কুমুদকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? তুমি কি শৈবাল?" বালিকা কুমুদ বলিল "না, আমি কুমুদ।" কাদম্বিনী একটু বিমর্ষ ভাবে বলিল "মিথ্যা কহিতেছ। তুমি শৈবাল। শৈবাল ভিন্ন এমন সুন্দর আর কেহ নয়।" কুমুদিনী আবারও বলিল "না, আমি কুমুদ"। কাদম্বিনী এবার অধীরের ন্যায় বলিয়া উঠিল "হা, হা, ঠিক বলিয়াছ। শৈবাল কোথায়? আমিই ত শৈবালকে মারিয়াছি।" কাদম্বিনী এবার চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমুদ একটু ভীত হইল; দেখিয়া কাদম্বিনী হাসিয়া পড়িল।

পরের সৌন্দর্য্য দেখিলে আপন কদর্য্য ভাব মনে পড়ে। পরের গুণ দেখিলে নিজের দোষগুলি স্মরণ হয়। সংসারের এই তুলনাই স্মরণ

দুঃখের কারণ। কাদম্বিনী এখন ভয়ানক উন্মাদ। তবু মাঝে মাঝে প্রকৃতস্থের ন্যায় কুমুদের মুখ পানে চাহিয়া থাকিত। কাদম্বিনী দেখিল কুমুদ তাহাকে বড় স্নেহ করে—বড় যত্ন করিতেছে। সে মনে মনে ভাবিল "শৈবাল কত ভাল, আমি কত মন্দ। শৈবালের কত গুণ, আমার কত দোষ।" কুমুদকে ডাকিয়া প্রকাশ্যে বলিল "শৈবাল, তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন? আমিই ত তোমাকে মারিয়াছি।" কুমুদ উত্তর করিল "না, আপনি আমাকে মারেন নাই।" এবার কাদম্বিনী কুমুদের মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "তুমি আরো ভাল হইয়াছ। তাইত, তুমি আরো সুন্দর হইয়াছ। আমি—" এই বলিয়া কাদম্বিনী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ডাকিয়া বলিল "অতুল, আয়রে বাবা, শৈবালকে পাইয়াছি।" এই বলিয়া কুমুদের গলা জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত মেলিল; কুমুদ ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কাদম্বিনী দেখিল, তাহার নিজের পাপ মূর্ত্তি যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে মূর্ত্তি যেন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "আমি শৈবালকে মারিয়াছি, আমি অতুলকে গৃহত্যাগী করিয়াছি, আমি স্ত্রীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন খোয়াইয়াছি, আমি সোনার সংসার ছারখার করিয়াছি।" কাদম্বিনী দেখিল, তাহার বিষধরী মূর্ত্তি তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বিষ উদ্গীরণ করিতেছে—সংসার তাহাতে পুড়িয়া যাইতেছে। কাদম্বিনী আত্মহারা হইয়া আত্মান্বেষণ করিতে লাগিল। ইহাতেই সে এখন দারুণ উন্মাদ।

তাহার উন্মত্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সে কখন চীৎকার করিয়া বলে "অই অই আসিতেছে, অই আসিতেছে, আমাকে ধর, আমাকে ধর, আমি গেলাম।" আবার বলে "যাই, আমি তাহার পায় পড়ি যাইয়া, সে আমাকে ক্ষমা করিবে। আমাকে ক্ষমা করিবে? না, না,

না, উঃ আগুন, আগুন, গেলাম যে।” অতুল ও কুমুদিনী কাদম্বিনীর যথেষ্ট শুশ্রূষা করিতে লাগিল; উন্মত্ততা কিছুতেই থামিল না।

এক দিন কাদম্বিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া, উত্তর দিগাভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত। গঙ্গাতীরে জলের উপরিভাগে এক অত্যোচ্চ প্রস্তর খণ্ড। প্রস্তর খণ্ডের নিম্নে সবেগ আবর্ত্তনময় গঙ্গার তীব্র স্রোত, অনন্তকাল সমুদ্র লক্ষ্যে চলিয়া যাইতেছে। কাদম্বিনী পশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। দাঁড়াইয়া পশ্চাৎগামী অতুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। বলিল “আমাকে ধরিবে? আমি যাই, আমি তাহার পায় পড়িতে যাই।” অতুল তাহাকে ধরিতে আসিতেছে, দেখিয়া কাদম্বিনী বলিল “মা গঙ্গে! আমাকে ধর। আমাকে রক্ষা কর মা।” এই বলিয়া উর্ম্মিময় গঙ্গা-বক্ষে লম্ফ প্রদান করিল। অতুল দেখিল কাদম্বিনীর ক্ষুদ্র দেহখানি গমনশীল আবর্ত্তনময় ভাগীরথী সলিলে ডুবিয়া গেল।

অতুলও সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ প্রদান করিল। অনেক অনুসন্ধান করিল; কাদম্বিনীর সন্ধান পাইল না।

সমাজ! চাহিয়া দেখ, যে কুসুম সংসারে থাকিয়া, সংসার যুড়াইতে পারিত; আজ তাহার কি পরিণাম। সমাজের অত্যাচারে বঙ্গ বালিকা বঙ্গ জননী হইতে পারিল না; নরকের কীট হইল। বঙ্গ গৃহিণী হইল না; মানুষের পাশব ক্রীড়ার পুতলী হইল। সংসারের ধন, গৃহলক্ষ্মী পথের ভিখারিণী হইয়া, আত্মহারা পাগলিনী হইয়া, নরক ভোগ করিতে করিতে অনন্ত নরকে প্রবেশ করিল। সমাজের অত্যাচারে কুসুম দেবশিরে না ফুটিয়া, নরকগর্ভে পড়িয়া গেল। বঙ্গ সমাজের কি হৃদয় নাই?

পাঠক! কাদম্বিনী পাগল হইয়া, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। কতকগুলি দুশ্চরিত্র পাটনাই মাঝি তাঁহাকে নদীতীরে পাইয়া, তাহার রূপ যৌবন দেখিয়া, তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিল। পরে তাহাকে রাজমহলে ছাড়িয়া গিয়াছিল। পাপের পরিণাম এইরূপ বিষময়।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অতুলচন্দ্র পিতৃব্যকে সঙ্গে করিয়া রেলপথে মুঙ্গের আসিল। বঙ্গ দেশে মুঙ্গের বড় স্বাস্থ্যকর স্থান। রাজমহলের ন্যায় মুঙ্গেরও গঙ্গার একতীরে অবস্থিত। মুঙ্গেরও পাহাড়ময় প্রদেশ।

অতুল আপনাদের অবস্থান জন্য যে স্থান মনোনীত করিল, সেই স্থান পাহাড় হইতে সামান্য দূর। এই স্থানের সম্মুখ ভাগেই উচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের নিম্নে ভাগীরথীর কুলকুলনাদী জলস্রোত। অপর পারে অসীম, অনন্ত বালুকা পূর্ণ প্রান্তর ধু ধু করিতেছে।

অতুল পিতৃব্যকে লইয়া মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছে। অতুলের যত্নে, কুমুদিনীর অনবরত শুশ্রূষায়, মুঙ্গেরের স্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে ভুবন মোহন রায় দিন দিন বেশ সুস্থ হইতে লাগিলেন।

এখন আর তাহাকে সমস্ত দিন পিতৃব্যের নিকট বসিয়া, তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে হয় না। সে এখন অবকাশ পাইয়াছে। এখন অতুল সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায়ই পর্ব্বতোপরি বেড়াইতে যায়। পার্ব্বত্য প্রদেশ তাহার নিকট বড় মনোরম বোধ হইয়াছে।

এক দিন অতুল সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে উন্মনস্কে এক পর্ব্বত হইতে আর পর্ব্বতে চলিয়া গেল। ক্রমে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে আসিয়া উপস্থিত। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যা দেখিয়া সূর্য্যদেব বিশ্রাম লাভার্থ চলিয়া গেলেন। জগত সংসার ক্রমশঃ অন্ধকারে ডুবিতে লাগিল। অতুলচন্দ্র ব্যস্তভাবে গৃহাভিমুখে চলিল।

অন্ধকারের পর অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সুদূরস্থ গিরিচূড়া সকলও অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু সম্মুখস্থ গিরিচূড়া সকল এখনও ধূসর বর্ণে অস্পষ্ট প্রকাশিত। অন্ধকারময় পর্ব্বত কোলে ঘুরিতে ঘুরিতে অতুল এক দুর্গম স্থানে আসিয়া উপস্থিত। অন্ধকার বশতঃ সেই স্থান হইতে অবতরণের কোন পথ পাইল না। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, কোথাও পথের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। এমত সময় অন্ধকারময় উচ্চ প্রদেশে হইতে বীণাধ্বনিবৎ একটী রমণী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "পথিক, আপনি পথ হারাইয়াছেন? পথ হারাইয়া থাকিলে আমার সঙ্গে আসুন, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি।" অতুল ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, কিছু দেখিতে পাইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায়?" আবার সেই স্বরে উত্তর হইল "উপরে উঠুন, পথ পাইবেন।" অতুল আশ্বস্থ হইয়া, পশ্চাৎস্থিত অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি উঠিল। উঠিয়াই দেখে, সম্মুখে অন্ধকারময় পর্ব্বত শিখরে সন্ন্যাসিনী দণ্ডায়মানা। অতুলকে দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বলিল "আসুন"; অতুল তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। কতক্ষণ হাঁটিয়া উহারা এক নিম্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত। ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকে পাহাড়; কেবল এক স্থানে একটী সামান্য পর্ব্বত বর্ত্মের নিম্ন দেশ অতিক্রম করিয়া, একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কল কল রবে বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়া

ভাগীরথী জীবনে আত্মসমর্পণ করিতেছে। এই স্থানে পর্ব্বত গাত্রে একটী সামান্য কুটীর। কুটীরে আলো জ্বলিতেছে।

সন্ন্যাসিনী অতুলকে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া, কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসিনী আর ফিরিল না। কতক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ জটাধারী উদাসী কুটীর হইতে বাহির হইলেন। অতুলের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি সহরে যাইবে? আমার সঙ্গে আইস।" অতুলচন্দ্র আবার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উদাসীর গমন দেখিয়া স্থির করিল, পর্ব্বত পথ তাঁহার নিতান্ত পরিচিত।

কতক্ষণ পর উদাসী অতুলচন্দ্রকে পরিচিত স্থানে রাখিয়া গেলেন। অতুল তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অভিবাদন করিল। সংসারত্যাগী যোগী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বৎস, সুখী হও।"

একদিন সন্ন্যাসিনী বৃদ্ধ জটাধারীর পদপ্রান্তে বসিয়া, ধীরে ধীরে বলিল "পিতঃ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার হৃদয় আবার সংসার প্রলোভনে প্রলোভিত হইতেছে। আমার দুর্ব্বল হৃদয় আবার—" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী নীরব হইল; চক্ষুপ্রান্তে জলবিন্দু দেখা দিল; তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে ঘোর মানসিক কষ্টের ছায়া পড়িল। উদাসী শান্তভাবে বলিলেন "বৎস! চঞ্চল হইও না। যে কার্য্যে তুমি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, বিবেচনা করিয়া দেখ, সংসার তাহার নিকট কত তুচ্ছ। যোগ মানুষের সহজ সাধ্য নয়।"

সন্ন্যাসিনী। "পিতঃ! আমি আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিতেছি না। আমার পাপ হৃদয় তুচ্ছ বিষয়েই আবার ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছে"। বলিতে বলিতে অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

উদাসী। মা, সংসারই প্রলোভন ময়। প্রলোভনকে পরিত্যাগ

করা সহজ নয় জানি ; কিন্তু প্রলোভনের কুহক হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। হায়! মনুষ্য হৃদয় এত দুর্ব্বল, এত অসার যে, একবার প্রলোভনের বিষময় ফল ভোগ করিয়াও পর-মুহূর্ত্তেই তাহাতে পুনরায় আত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বৎস! সংসারে কি সুখ, উপভোগ করিয়াছ? তবে আবার সেই পথে ফিরিবার জন্য অধীর কেন? যাহাকে দেখিয়া, হৃদয়ে আবার তুচ্ছ সুখের ইচ্ছা প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে ভুলিয়া যাও। যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে, সেই পুণ্যধামে তাহাকে অনন্ত জীবনের জন্য পাইবে।

সন্ন্যাসিনীর চক্ষু হইতে আবার জলস্রোত বহিল। উদাসী পুন-রপি বলিলেন "মা, যে হৃদয়ের জন্য অদ্য তোমার হৃদয় ব্যাকুল, তাহা এখন অন্য অধিকারে। আমি অনুসন্ধান লইয়াছি, ইহা একটি বালিকা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গত কথা ভুলিয়া যাও। সেখানে সবে মাত্র এখন সংসার-সুখের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি যাইয়া কি তথায় অশান্তি স্থাপন করিবে? একবার ভাবিয়া দেখ, এই সামান্য সুখের অনুসন্ধানে যাইয়া, কতকগুলি প্রাণীর সুখ একেবারে নষ্ট করিতে হইবে। সংসারে যিনি তোমার আরাধ্য দেবতা, তোমার হৃদয় মন্দিরে যাঁহার মূর্ত্তি চির প্রতিষ্ঠিত, তিনি গত কথা ভুলিয়া, আবার কতকটা সুখ পাইয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার সে সুখে যেন কোন বিঘ্ন উপ-স্থিত না হয়। সংসারে আত্মোৎসর্গ করিয়া, প্রিয়জনের সুখ সাধনই প্রকৃত স্নেহের কার্য্য। তোমার হৃদয় স্নেহে পরিপূর্ণ; তোমার প্রিয় পদার্থ সুখী, ইহা ভাবিয়া সুখী হও; দেবতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। লোকে প্রিয়জনের সুখের জন্য কত কি করিয়াছে, কত কি করিতেছে। নিজের সুখ নাশ সামান্য কথা; কত জনে তজ্জন্য আপনার একমাত্র প্রিয় পদার্থ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে।"

সন্ন্যাসিনী চক্ষুজল মুছিয়া ফেলিল। অতি দীন ভাবে উদাসীর পদ প্রান্তে হস্ত সংলগ্ন করিয়া বলিল "পিতঃ! ক্ষমা করুন। আমি দুর্ব্বল হৃদয় স্ত্রীলোক। আমার হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। তাহাতেই আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া যাইতে উতলা হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার হৃদয় স্বার্থে পরিপূর্ণ, তাহাতেই আবার সুখের সংসার অশান্তি বপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। দেব, আমি বুঝিতে পারি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার হৃদয়ে বল দিন্। তবে এক প্রার্থনা, একবার কি সেই সোনার প্রতিমাখানিকে দেখিতে পারি না?"

উদাসী। মা, প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল মনুষ্যের আপন হৃদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। তবে অপরিমিত শিক্ষাগুণে হৃদয়ের এরূপ অবস্থাও হইতে পারে, যখন তাহা কিছুতেই বিচলিত হয় না। পূর্ব্বে সেরূপ বল লাভ কর। যোগ জীবনের বৈরাগ্য লাভ হউক্; পরে ইচ্ছা পূর্ণ করিও। তখন সংসারের এমন ক্ষমতা থাকিবে না যে, তোমার হৃদয়কে প্রলোভিত করিতে পারে। তখন তোমার হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত, সংসার সুখের মোহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস পাইবে না।

সন্ন্যাসিনী অবনত মস্তকে উদাসী-বাক্য শিরোধার্য্য করিল। উদাসী সন্ন্যাসিনীর ক্ষুদ্র মাথাটী আপনার বুকে টানিয়া লইয়া, উহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসিনী উদাসীকে দেবতা বলিয়া জানিত। সে ভাবিল, তাহার মস্তক স্বর্গে নীত হইয়াছে। তাহার হৃদয়ের চঞ্চলতা অনেক দূর হইল। তথাপি সন্ন্যাসিনী বলিল "পিতঃ! যদি আমি শীঘ্র মরি, তাহা হইলে আমার এই বাসনা পূর্ণ করিবেন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "তাহাই হইবে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সংসারে রমণী হৃদয় বড় সুন্দর, বড় সরল। রমণী হৃদয় এই কর্কশ সংসারে স্নেহপূর্ণ রাজ্য। উহা এত কোমল যে, সামান্য সুখে কিম্বা সামান্য দুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে। পিতা প্রাণাধিক সন্তানের শোক সংজে ভুলিয়া যান, কিন্তু কোমল হৃদয় মা চিরদিন সেই শোকে দগ্ধ হইয়া তজ্জন্য রোদন করেন। কুটিল হৃদয় পুরুষ তর্কস্থলে উপস্থিত না করিয়া, কিছুই বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যদি রমণীকে, বল পর্ব্বতের জীবন আছে; সরল হৃদয়ে সে তাহাও বিশ্বাস করিবে। প্রিয় পাঠক! তোমার প্রেয়সী তোমাকে প্রাণ মন দিয়া পূজা করিতেছে, তোমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, তবু তোমার মন উঠিতেছে না। কিন্তু তুমি তাহার সহিত একবার হাসিয়া কথা বল, তাহার মন স্বর্গে উঠিয়া যাইবে। তুমি কি তাহা পার? পুরুষ সংসার আলোচনা করিয়াছে; তাহাতেই পুরুষের হৃদয় কুটিল, কর্কশ ও স্বার্থপর। রমণী এখন পর্য্যন্তও সংসার জ্ঞানের প্রবল স্রোতে ভাসে নাই; তাহাতেই প্রকৃতি প্রদত্ত সরলতা, নিঃস্বার্থতা, স্নেহ, মমতা তাহাদের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। তাহাতেই ভালবাসা, ভক্তি, কোমলতা প্রভৃতি মধুর গুণ সকল এখনও সেখানে বিরাজিত। এখন পর্য্যন্তও তাহারা সংসার-দগ্ধ পুরুষকে নিঃস্বার্থ স্নেহ সলিলে শীতল করিতে সক্ষম।

বস্তুতঃই রমণী ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি। ভালবাসাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য, জীবনের সুখ। কিন্তু যদি তাহাদের সেই স্বর্গীয় ইচ্ছা প্রতিহত হয়, তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। ইহা তাহাদের দুঃখের

একমাত্র কারণ হইয়া পড়ে। রমণীর চতুর্দ্দিকে ভালবাসা ভূবায়ুবৎ অবস্থান করিতেছে। ইহা তাহারা নিশ্বাস করে, প্রশ্বাস করে, ইহাতে তাহারা অবস্থান করে। ইহাতে তাহাদের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভালবাসা রমণীজীবনের সার। ইহা তাহাদের নয়নজ্যোতিতে প্রকাশ পায়; হাস্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়; তাহাদের কোমল কণ্ঠে ইহা সঙ্গীতধ্বনিবৎ নিশি দিন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। স্ত্রী স্বামীকে যে স্নেহে ভালবাসে, সংসারে কয়জন স্বামী স্ত্রীকে সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা দিতে পারিয়াছেন? মা সন্তানের জন্য হৃদয়ে যে স্নেহ রাখিয়াছেন, কয়জন সন্তান মাকে সেই পরিমাণ ভালবাসা দিতে পারিয়াছে? সেই পরিমাণ ভক্তি মার চরণে ঢালিতে পারিয়াছে? জগতের দিকে চাহিয়া দেখ—দেখিবে রমণী-হৃদয়ের ভালবাসা পুরুষ-হৃদয়ের ভালবাসা হইতে কত অধিক, কত উচ্চ, কত নিঃস্বার্থ। রমণী না থাকিলে পুরুষ বাঁচিত কেমন করিয়া? আমরা দাসত্বদলিত বাঙ্গালী—আমরা বুঝি, রমণী না থাকিলে পুরুষ একবারেই বাঁচিত না। আমরা কি বলিব না "মা গো! বউ গো! বোন্ গো! তোমরা না থাকিলে আমরা কি করিতাম? আমরা এই ভ্রুকুটীময় সংসারে কাহার দিকে চাহিয়া প্রাণ জুড়াইতাম? বিষয়ের কাছে যাই, সেখানে যাইয়া দেখি অভাবের ভ্রুকুটী। হৃদয়ের মধ্যে চাই—সেখানে দেখি অবলম্বন শূন্যতার ভ্রুকুটী। বিপুল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখি—সেখানে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বময় উপেক্ষার ভ্রুকুটী। প্রভুর কাছে যাই—সেখানে দারুণ দাসত্বের ভ্রুকুটী। এরূপ ভ্রুকুটীময় জীবনে তোমরা না থাকিলে আমরা বাঁচিতাম কেমন করিয়া? সংসারের ভ্রুকুটী দেখিতে দেখিতে ঘরে ফিরি—সেখানে যাইয়া দেখি তোমাদের হাসি মুখ, তোমাদের স্নেহ মমতা, তোমাদের আত্মোৎসর্গ। আমরা তখন সংসার ভুলিয়া, দাসত্ব

ভুলিয়া শান্ত হই। তাহাতেই বলি "বঙ্গ কুলবধূ, তোমরা না থাকিলে বাঙ্গালীর প্রাণ জুড়াইত কেমন করিয়া ?

যে রমণী-হৃদয় এত স্নেহময়, এত কোমল, সুখ দুঃখে তাহা সহজেই উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসিনী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাহার কোমল হৃদয়ে ভয়ানক ঘাত প্রতিঘাত। একবার সেই হৃদয়খানি সংসার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছে ; আবার যেন কি এক অপার্থিব বল তাহাকে অন্য দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দ্বিবিধ আকর্ষণে তাহার কোমল হৃদয় ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। সন্ন্যাসিনী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ; দিন দিন মলিন হইয়া শুকাইতে লাগিল। উদাসী প্রথমে মনে ভাবিলেন, এই দুর্ব্বলতা অধিক দিন থাকিবে না। শিক্ষাবলে সমস্তই সহ্য হইয়া যাইবে।

কিন্তু দিনত চলিতে লাগিল ; এই রোগের প্রতিকার হইল না। সন্ন্যাসিনীর জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সে এখন শয্যা-শায়িনী। উদাসী প্রাণপণে কত শুশ্রূষা করিলেন, দেবতাকে কত ডাকিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। উদাসী নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদি-লেন। অবশেষে স্থির করিলেন "একটী জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় হউক, তথাপি কতকগুলি জীবনদীপকে হীনপ্রভ হইতে দেওয়া উচিত নয়

আজি উদাসী বুঝিল বালিকার মৃত্যু উপস্থিত। সন্ন্যাসিনীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ডাকিলেন "মা, আজি বড় কষ্ট বাড়িতেছে ?" সন্ন্যাসিনী মৃদুস্বরে বলিল "আমি আর বাঁচিব না।"

উদা। "মা, মৃত্যুকে ভয় করিও না। হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ সেই অনন্ত দেব তোমার অন্তরে। তাঁহাকে ডাক, তিনি তোমার সকল ভয় দূর করিবেন।" অমনি তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সুশোভিত করদ্বয়

পরস্পর যুক্ত হইল। ইন্দিবর তুল্য আঁখিদ্বয় মুদিত হইল। মনে মনে যুবতী পরম পুরুষকে ডাকিল। উদাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমার অন্য কোন অভিলাষ আছে?"

বালিকা। "পিতঃ! যদি অনুমতি করেন, তবে একবার এসময় তাঁহাকে দেখিব।"

উদাসী কুটীর ত্যাগ করিয়া ত্বরিত গতিতে কোথায় চলিয়া গেলেন। এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই তিনি অতুলচন্দ্র ও কুমুদিনীকে সঙ্গে করিয়া আবার কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

যুবতী চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যোপরি শয়ানা। উদাসী ডাকিলেন "মা, প্রাণাধিকে, শৈবলিনি, একবার চাহিয়া দেখ, অতুলচন্দ্র আসিয়াছেন।" অতুল দেখিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িল। কুমুদিনী বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। শৈবলিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিল; হর্ষভরে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। একদৃষ্টে অতুলের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

শৈবলিনী আগ্রহ বিকম্পিত স্বরে অতুলকে বলিল "আমার কাছে আসিয়া বস। আমি তোমাকে দেখি। অনেক দিন দেখি নাই; আমি এই সংসার ছাড়িয়া যাইতেছি; আজি আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি।"

কুমুদ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শৈবাল বলিল "ভগিনী, তুমিও আমার নিকটে আইস। আমি একবার প্রাণ ভরিয়া তোমাদিগকে দেখি।"

অতুল একবারে উন্মত্ত ভাবে শৈবলিনীর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। "শৈবাল! আমার চির দুঃখিনী শৈবাল! আমাকে ক্ষমা কর" এই বলিয়া অতুল উন্মাদের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। অতুলের চক্ষে

জল দেখিয়া, শৈবলিনী বলিল "আমার জীবনের সার! কল্পনার দেবতা! তুমি ক্ষমা চাহিতেছ? বল, একবার এই সময় বল, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া গৃহ ত্যাগ কর নাই। সেই কথা না শুনিয়া মরিলে আমার পরকালেও শান্তি নাই।"

অতুল। শৈবাল! তোমাকে অবিশ্বাস—তুমি কেমন করিয়া এই কথা মনে স্থান দিলে? আমি যে কারণে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম তাঁহা কি তুমি শোন নাই? শৈবাল! উঠ, আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? চাহিয়া দেখ এই পামরের—এই পাষাণের অন্তরে কি আগুণ। তুমি স্বর্গের দেবতা, আমি নরকের কীট। তাহাতেই তোমার মূল্য বুঝি নাই, তাহাতেই তোমাকে অনাদর করিয়াছি। আমার এই পাপের—এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

শৈবাল। "আমার হৃদয় রত্ন! এখন আমি তোমাকে দেখিলাম। তোমার নিজমুখে শুনিলাম—তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর নাই। ইহা হইতে আমার আর কি সুখ হইতে পারে? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলে, শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল। আমি তাহা সহ্য করিতে পারি নাই। আমি বিষ খাইয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা কর।" অতুলকে কাঁদিতে দেখিয়া শৈবাল বলিল "তুমি কাঁদিও না, আমাকে কাঁদাইও না। আমি তোমার উপযুক্ত নই বলিয়া যে, মনে কষ্ট ছিল, তাহাও এখন দূর হইল।" কুমুদের উদ্দেশে শৈবাল বলিল "কোথায়, ভগিনী, তুমি কোথায়? আমার কাছে একবার আইস। একবার আমাকে দিদি বলিয়া ডাক।"

কুমুদিনী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, সে আসিয়া শৈবালের পার্শ্বে বসিল—বসিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। শৈবাল কুমুদের হস্তে অতুলের হস্তে দিয়া বলিল "ভগিনী, এই রত্ন সংসারে বড় জালা যন্ত্রণা পাই-

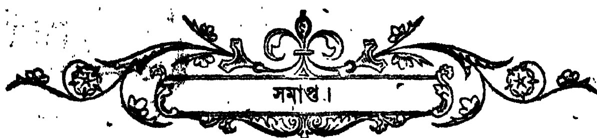
রাছে ; যত্নে ইহাকে হৃদয়ে রাখিও। স্ত্রীলোকের ইহাপেক্ষা ধন নাই, স্ত্রীলোকের ইহাপেক্ষা ধর্ম্ম নাই।” আমি এই দেবতার সেবা করিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সেবা করিও। এই রত্ন যেন গত কথা সকল ভুলিয়া যাইতে পারেন।”

কুমুদ বালিকা, কোন কথাই কহিতে পারিল না, কেবল অবিশ্রান্ত চক্ষু-জলে শৈবালের বক্ষ ভিজাইতে লাগিল। একবার মাত্র তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে বাহির হইল “দিদি”।

উদাসীনের দিকে চাহিয়া শৈবাল বলিল “পিতঃ! আমি চলিলাম। আমার মার কাছে আমি চলিলাম। আমাকে চরণ ধূলি দিন।” আজ সংসারত্যাগী, আত্মসংযমী যোগীর আত্মসংযম দূর হইল। উদাসী কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মত্তের ন্যায় একবারে শৈবালের ক্ষুদ্র দেহ কোলে তুলিয়া লইলেন। সংসার মায়ায় আবার শৈবালের চিত্ত ফিরিবে আশঙ্কায় এত দিন তাহার নিকট আত্মপরিচয় দেন নাই। আজি আর পারিলেন না। আজি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন ; বলিলেন “মা, শৈবলিনি! একবার তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতার দিকে চাহিয়া দেখ, তাহার যোগ ভঙ্গ হইতেছে। তুমি তোমার মার কাছে চলিয়াছ ; সে পুড়িয়া মরিতেছে।”

শৈবলিনীর নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছিল। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। হস্ত পদ শিথিল হইয়া চক্ষু নিমীলিত হইতে ছিল। উদাসীনের কথা শুনিয়া যেন তাহার শরীরে আবার তাড়িত স্রোত প্রবাহিত হইল। অতি দীন, অতি অস্ফুট স্বরে শৈবাল বলিল “আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা? বাবা, এই কথা কেন এত দিন বল নাই। আমি মরিতাম না।” এই বলিয়াই একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অতুল ডাকিল “শৈবাল!” আবার সেই অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নদ্বয় একটিবার

হইল; অধরপ্রান্তে ক্লেশের রেখা দেখা দিল। মৃত্যু যাতনায় সতৃষ্ণ লোচনে অতুলের মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল "আমাকে ধর।" আর কথা ফুটিল না; পিতার অঙ্কে দেহ রাখিয়া, অতুলের দিকে চাহিতে চাহিতে শৈবাল আজি প্রাণত্যাগ করিল। যে স্নেহ প্রতিমা, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তির সংসার দাহন যোগধ্যানে বুঝিতে পারিয়া, নিরুদ্দিষ্ট পিতা শ্মশান হইতে তুলিয়া আনিয়া, তাহাকে পর্ব্বত কন্দরে যোগ শিক্ষা দিতেছিলেন; আজি তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল। যে কোমল কুসুম সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বৃন্তচ্যুত হইয়া, স্বামী জীবিত সত্ত্বেও বিধবার ন্যায় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে যোগিনী সাজিয়াছিল; আজি তাহা অনন্তে মিশিয়া গেল। হায়! কবে বঙ্গ সংসার ঝঞ্ঝাবাত শূন্য হইবে? কবে সেই সংসার উদ্যানে কুসুম নিচয় পরিপোষিত ও সদ্ব্যবহৃত হইয়া সংসার শান্তিময় হইবে?



অতুল চন্দ্র (উপন্যাস), হীরাবাই (উপন্যাস), সরোজা (উপন্যাস), আমার গানও কবিতা, মল্লিকা, চাঁদের বিয়ে (জাতীয় উপহার ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ), শারদা (জাতীয় উপহার ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ), দুঃখিনী (জাতীয় উপহার ৩য় খণ্ড), সঙ্গীত লহরী (২য় সংস্করণ)।

শ্রীতারকেশ্বর দাস গুপ্ত।
ম্যানেজার।

Pratibha—by Barada Kanta Sen Gupta.

Like the other two works ("Bengali Meye" and "Chira Sangini") noticed above this one is also written with a social purpose. In structure and execution, however, it is immensely superior to the two preceding works. The course of events in this story is of the most natural kind and does not, like the two stories examined above, conflict with any custom, usage, or practice of Hindoo Society. Pratibha is a model Hindoo girl, all above, all simplicity, all obedience and all resignation. She is portrayed with true dramatic skill. As a child, she is sweet and charming, as a grown up girl she is charming, noble and grand. Her calm resignation under her early misfortunes moves us far more strongly and effectively against infant marriage than all the rebellious movements, the theatrical laments and hysterical harrangues of heroines like those of Chira Sangini and Bengali Meye. Babu Barada Kanta Sen Gupta has written a tale which is thoroughly Bengali, except in one particular, and that is why his tale has been so charming and impressive. The tale though short and unpretending will have a chastening and elevating influence on the mind. We shall never forget Pratibha for she is one of the sweetest, loveliest and noblest character in Bengali literature. We have not seen children's love delineated any where else of Bengali literature, with such ease and grace and fidelity to nature, as we do in Pratibha. The only un-Bengali part of the story is the very last portion, in which Pratibha is represented as writing a letter to Gunendra desiring an interview with him. A Bengali widow of the elevated type of Pratibha is a genuine stoic who will bury for ever her fondest

desires and remembrances with commencement of her widowhood and fill up the measure of her noble self-sacrifice by calmly suppressing the most sacred fire that may be burning in her heart. The un-Bengali turn given to the story in this part, is due to the author's English education and is indicative of a kind of mental weakness, which in Europe in the present day, is mis-styled "refinement of feeling." Taken by itself however, it is not a very bad turn and may be excused. We therefore recommend Pratibha to all our readers and specially to the many Bengali novelists, who write novels with social purpose. These novelists may get many good and useful hints by reading Pratibha with care and attention. *The Calcutta Review*, January 1886.

Pratibha (by Babu Barada Kanta Sen Gupta) is a nicely written book remarkable for the simplicity of its style. The tale is a short one but full of interest.—*Statesman and Friend of India*, March 18, 1888.

Pratibha by Babu Barada Kanta Sen Gupta is a pathetic story of a young Hindoo widow written from the Hindoo stand-point. *Bengal Administration Report*.

Bharat Bhraman (Part I)—* * * by Babu Barada Kanta Sen Gupta * * * It contains a good deal of useful information about Northern India and is full of research and description of antiquities. We recommend this book to all our Bengali readers.—*The Englishman*, April 27, 1888.

Bharat Bhraman contains an account of principal cities and towns which the author visited in the course of his journey through India. The book contains a good deal of useful information, a perusal of which will interest the reader.—*Statesman and Friend of India*, March 18, 1888.

Bharat Bhraman (Part I). It is an account of the writer's tour through Bengal, Behar, the N. W. Provinces and Central India. It embodies brief notices, historical and anecdotal of the places he visited along the route. The style is sometimes unnecessarily light but the writer has put his ideas in a very interesting and useful garb.—*Indian Mirror*, 19th May 1888.

ব্যক্তিগত মত ।

To BARODA KANTA SEN GUPTA.

18, Ratan Mistry's Lane, Calcutta

SIR,

I have read with great pleasure your little story called "প্রতিভা।" and I wish to know if you will allow me to translate it into English. An early reply will greatly oblige.

SAIDPUR. N. B. S. RY.

Yours faithfully
J. GILMORE-COX.

My dear Barada Babu,

* * * *

I owe you an apology for not having written to you so long about the book you so kindly presented to me. My wife was first to read your "Pratibha." She finished it with the remark that she had not read such a good book for a long time. I thought it was saying too much in these days of the Banga Bashee literature. I therefore instantly read the book myself and I must say that I was equally charmed with it. Indeed the book has been a perfect surprise to me. I made my boy read it and that is what can be said of scarcely any Bengali "novel" Poet Bankim Chandra's not excepted. &c. &c.

FENI

Yours Sincerely
NABIN CHANDRA SEN.

(Author of "Kuru Kshettra," "Palashir Juddha," "Raibatak," "Ranga mati," &c. &c.)

চাঁদের বিয়ে—আমরা এই ক্ষুদ্র পদ্যময়ী পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আজ কাল এরূপ গ্রন্থ সকলেই লেখেন বটে, কিন্তু ইহার লেখার ভাব ও প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন, সুন্দর ও বিশুদ্ধ। আমরা ইহার লেখা দেখিয়া বরদা বাবু যে এক জন উত্তম সাময়িক কবি তাহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। ভরসা করি বরদা বাবু সময়ে সময়ে আমাদিগকে এরূপ সুন্দর উপহার দিয়া সুখী করিবেন। সময়। ১৬ শে চৈত্র, ১২৯১ বাং।

চাঁদের বিয়ে—যদিও এই পুস্তক খানি আয়তনে ক্ষুদ্র তথাপি রচনা চাতুর্য্যে ক্ষুদ্র নয়। ইহার স্থানে স্থানে সুন্দর কবিতা আছে। ০ ০ ০ ০ আমরা এই বই খানি পড়িয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম।—সারস্বত পত্রিকা, ২৩ শে চৈত্র, ১২৯১ বাং।

—চাঁদের বিয়ে—এই সরল কবিত্বময় ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। ১০ পয়সা ব্যয় করিয়া যাঁহারা এই পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন না।—নব্য ভারত।

প্রতিভা—প্রতিভার চরিত্র মোটের উপর সুন্দর হইয়াছে। ০ ০ ০ প্রতিভার মাতার মৃত্যু বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। ০ ০ ০ প্রতিভার ভাষা সরল, স্বাভাবিক, সহজ ও মধুময়। এই উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। নব্য ভারত।

প্রতিভা—ছোট্‌টো মেয়েটীর ছোট্‌টো গল্প বেশ পারকার, সুন্দর ও মধুর। লেখকের সংক্ষেপে চরিত্র বর্ণনার ক্ষমতা আছে। তাঁহার সোনার পুতুল প্রতিভাকে তিনি যে ভাবে আঁকিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বড় সুন্দর হইয়াছে। সে বালিকাটীকে প্রথম যখন তাহার মাতার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে দেখিলাম তখন হইতে সেই যে মধুর স্বভাবে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। শেষ যখন মা তাহার ক্ষুদ্র জীবনের এক কষ্টের অভিনয় দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিলাম ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমাদের সে মুগ্ধতা ঘুচিল না। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। কল্পনা।

প্রতিভা—* * বরদা বাবুর লেখা পড়িতে পড়িতে জনসন্, আডিসন্ ইত্যাদি ইংরেজী সুলেখকদিগের লেখা মনে পড়িল। * * * প্রতিভা যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহার আনুষঙ্গিক সকলই সেইরূপ সুন্দর। এমন কি প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে হইয়াছে, কাঁদিতে হইয়াছে। প্রতিভা বঙ্গ সাহিত্য সংসারে একটী অমূল্য ধন। ভরসা করি বরদা বাবু তাহার খনি হইতে প্রতিভার মত আরো কিঞ্চিৎ রত্ন উদ্ধৃত করিয়া দরিদ্র বঙ্গ সাহিত্যের অভাব মোচন করিবেন। আমরা আশা করি প্রতিভা যেমন সুন্দর সেরূপ সকলের আদরণীয় হইবে।—সময়, ১১ চৈত্র, ১২৯১ সাং।

প্রতিভা—প্রতিভা একটী প্রতিভা-সম্পন্না সুন্দরী বালিকা। * * * বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার মানসিক সৌন্দর্য্যই অধিক। প্রতিভা অমায়িকতা, সরলতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার আধার। তাহার হৃদয় পবিত্র প্রেমের উৎস। * * আমাদের সংস্কারকগণ প্রতিভার চরিত্র পাঠ করিলে অনেক শিখিতে পারিবেন। হিন্দু রঞ্জিকা, ১৬ চৈত্র ১২৯৪।

চাঁদের বিয়ে—বরদা বাবুর প্রত্যেক পুস্তকেই কিছু নূতনত্ব আছে। প্রতিভার ন্যায় চাঁদের বিয়েও নূতন রকমের পুস্তক। চাঁদের বিয়ে পুস্তকে মৌলিকতা ও ভাবুকতার পরিচয় আছে। * * * চাঁদের বিয়ে আমরা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এরূপ সুন্দর কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল। হিন্দু রঞ্জিকা ১৬ চৈত্র, ১২৯৪।

ভারত ভ্রমণ, ১ম খণ্ড—বরদা বাবু বঙ্গ সাহিত্য সংসারে অপরিচিত নহেন। তাঁহার রচিত হেমপ্রভা, প্রতিভা, চাঁদের বিয়ে প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি তাঁহার ভারত ভ্রমণ পাঠেও তদ্রূপ সুখী হইয়াছি। * * এখানি এই [illegible]। [illegible] লাভ করিতে পারা যায় তাহা এ [illegible] খানি পাঠ করিলেই [illegible] করিতে পারেন। * * * আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এ গ্রন্থ খানি [illegible] না কেন, তিনিই তৃপ্তি লাভ করিবেন। সময়, ২৭ [illegible] ১২৯৫।